বিজ্ঞান সিরিজ

মহাশূন্য এবং পৃথিবী

জাকারিয়া স্বপন

সূচিপত্র

১. মহাবিশ্ব - পৃষ্ঠা ১১

বিগ ব্যাং কি? মহাবিশ্বের বয়স কত? ব্ল্যাক হোল কি?
মিল্কি-ওয়ে কি? আমাদের সবচে কাছের গ্যালাক্সি কোনটি?
তিন ধরনের গ্যালাক্সি। মহাশূন্যে গতি কত?
আমাদের গ্যালাক্সির প্রতিবেশী। গ্যালাক্সিগুলো কি একত্রিত হয়ে যেতে পারে?
নেবুলা কি? সুপারনোভা কি একটি নক্ষত্রের মৃত্যু?
ক্র্যাব নেবুলা। সাইজিজি। ডার্ক মেটার

২. নক্ষত্র - পৃষ্ঠা ২৯

বাইনারি ষ্টার কি? নক্ষত্রের রঙ দিয়ে কী বুঝায়?
বিগ ডিপার কি? নর্থ ষ্টার কোথায়? সামার ট্রায়াঙ্গল কি?
কতগুলো কনষ্টেলেশন আছে? পৃথিবী থেকে সবচে কাছের নক্ষত্র কোনটি?
সূর্যের তাপমাত্রা কত? সূর্য কী দিয়ে তৈরী? সূর্য কবে মারা যাবে?
সূর্যের রঙ পরিবর্তন হয় কেন? সোলার ইকলিপসিস কখন ঘটে?
সোলার ইকলিপস দেখার নিরাপদ উপায় কী? সান ডগ। সোলার উইন্ড
রাতের আকাশের সব নক্ষত্র কি আমাদের গ্যালাক্সির?
হোয়াইট ডুয়ার্ফ। কসমিক রেডিয়েশন

৩. সোলার সিষ্টেম - পৃষ্ঠা ৩৯

সোলার সিষ্টেমের বয়স কত? সূর্য থেকে অন্যান্য গ্রহগুলোর দূরত্ব কত?
সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে গ্রহগুলোর কত সময় লাগে? গ্রহগুলোর রঙ কী?
ইনফেরিয়র এবং সুপেরিয়র গ্রহ কোনগুলো? বিভিন্ন গ্রহের চাঁদ
কোন গ্রহের রিং আছে? গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মান। জোভিয়ান এবং টেরেষ্ট্রিয়াল গ্রহ
গ্রহগুলোকে নক্ষত্রগুলো থেকে কিভাবে চেনা যায়? প্লানেট এক্স
সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম এসেছে কিভাবে? ভেনাস কি রূপবতী?
মঙ্গল গ্রহ কি পুরুষ? মঙ্গল গ্রহে কি জীবন আছে?
জুপিটার কি গ্রহদের রাজা? শনি কি একটি অশুভ গ্রহ?
সবচে দূরের গ্রহ কোনটি? পৃথিবীর ঘুরার গতি কি পরিবর্তিত হয়?

৪. কমেট, মেটিওরাইট এবং অন্যান্য - পৃষ্ঠা ৫৯

এষ্টেরয়েড, টুনগাসকা ইভেন্ট। হ্যালির কমেট কবে ফিরে আসবে?
মেটিওরাইট এবং মেটিওরয়েডের পার্থক্য
পৃথিবীতে কতগুলো মেটিওরাইট এসে পৌঁছে?
পৃথিবীতে প্রাপ্ত বৃহত্তম মেটিওরাইট কোনটি?
কত ধরনের মেটিওরাইট আছে? মেটিওরাইট চেনার উপায়
আন্তর্জাতিক মেটিওর সংস্থা

৫. পৃথিবী একটি গ্রহ - পৃষ্ঠা ৬৯

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের স্তর
আকাশ নীল কেন? পৃথিবীর ভর কত? পৃথিবীর পরিধি
পৃথিবীর গর্ভে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয় কিভাবে?
পৃথিবীর পৃষ্ঠ কী দিয়ে তৈরী? পৃথিবীর পৃষ্ঠ কতগুলো প্লেটের উপর ভাসছে?
পৃথিবীর পৃষ্ঠে কতটুকু পানি আর মাটি? পৃথিবীর কত অংশ স্থায়ীভাবে বরফ দিয়ে ঢাকা?
এন্টার্কটিকার বরফ কত পুরু? আইস এজ কখন হয়েছিল?
পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি। সকল ক্র্যাটার কি আগ্নেয়গিরির অংশ?
চাঁদের দূরত্ব। নীল চাঁদ কি আসলেই নীল? চন্দ্র গ্রহন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

৬. মহাশূন্যে মানুষ - পৃষ্ঠা ৮১

লাইট ইয়ার। টেলিস্কোপ। আউটার স্পেস ট্রিটি
নাসা। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন। কেনেডি স্পেস সেন্টার
মহাশূন্যে প্রথম মানুষ। ভয়েজার ১ ও ২। চাঁদের মাটিতে মানুষ
কক্ষপথে প্রথম পশু। চাঁদে প্রথম খাবার। মহাশূন্যে প্রথম নারী
প্রথম স্যাটেলাইট। মহাশূন্যে দূর্ঘটনা।
সোভিয়েট মহাকাশ কার্যক্রম। টাইম ট্রাভেল করা কি সম্ভব?
স্পেস ওয়াক। মির কী? মহাশূন্যে বিবাহিত যুগল
এক্সট্রাটেরিস্টেরিয়াল জীবন। রকেট। উড়ন্ত সসার

৭. মহাবিশ্বের মানুষ - পৃষ্ঠা ১০৭

হাবল। ষ্টিফেন হকিং। গ্যালিলিও গ্যালিলেই
নিকোলাস কুপার্নিকাস। জোহানেস ক্যাপলার
স্যার আইজাক নিউটন। সার্গেই করোলভ। আর্বেইন লি ভ্যারিয়ার
এলেক্সিস বাউভার্ড। জোহান গটফ্রাইড গ্যালে
জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ক্লাইড টমবাগ। কল্পনা চাওলা

ভূমিকা

অনেকদিন ধরে বিজ্ঞানের একটি সিরিজ লিখব বলে পরিকল্পনা করছি। তারপর যখন কাজে হাত দিলাম, মনে হলো একবছরেই চারটি বই লিখে ফেলতে পারব। সেগুলোর বিষয়ও ঠিক করা হলো- ১. মহাশূন্য ২. সাধারণ বিজ্ঞান ৩. কমিউনিকেশন এবং ৪. জীববিজ্ঞান। পুরো পরিকল্পনার শেষে বেশ উৎসাহ নিয়েই কাজ শুরু করলাম। প্রথমেই মহাশূন্য নিয়ে কাজ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বইটার একটা রূপ তৈরী হয়ে গেল। খুব ভালো অনুভব করতে শুরু করলাম।

কিন্তু তারপর কাজে লম্বা বিরতি পড়ে গেল। এটা যেহেতু আমার পেশা নয়, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকটা সময় চলে গেল। এবং বইয়ের কাজ ভীষণভাবে ধীরগতির হয়ে গেল। আর এখন শেষ মুহূর্তে এসে একটি বই শেষ করতেই হিমশিম। অবশেষে একটি বই বেরুচ্ছে, সেটা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হচ্ছে। কিন্তু নিজের কর্মদক্ষতা দেখে খুবই হতাশ হয়ে পড়ছি, মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ। আশা করছি এটাকে আরেকটু বাড়াতে পারবো। এবং বাকি বইগুলো আরেকটু দ্রুতগতিতে বেরুবে।

বইটি লেখা হয়েছে মূলত স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের দিকে লক্ষ্য রেখে। মহাশূন্য একটি বিশাল বিষয়, অনেকটা মহাশূন্যের মতোই বিস্তৃত। এর সবকিছু খুব সহজেই বুঝানো মুশকিল। আইনস্টাইন থেকে শুরু স্টিফেন হকিং-এর মতো বিজ্ঞানীরা বিতর্ক করেছেন। আবার অনেক বিষয় এখনও প্রমাণিত নয়। তাই অনেক জটিল তত্ত্ব এখান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। মহাবিশ্ব এবং এটাকে জয় করার জন্য মানুষের যে অদম্য চেষ্টা সেটাকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝার সুবিধার্থে যথাসম্ভব চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এই বইটির মাধ্যমে একটি বেসিক ধারণার জন্ম হলে পরবর্তীতে আরো জটিল বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে বলে আশা করছি। তবে একটি জিনিস সবসময় মনে হয়, বিজ্ঞান একটা সময়ে খুব সহজ ছিল যখন মানুষের জ্ঞানের পরিধি কম ছিল। ধীরে ধীরে এটা জটিলতর হয়ে উঠছে; বিশেষ করে কমপিউটারের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা এখন অনেক বেশি ডাটা প্রসেস করতে পারি, অনেক ভালো সিমুলেশন চালাতে পারি। এগুলো আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে যেমন বাড়িয়ে দিচ্ছে, তেমনভাবে জটিলও করে তুলছে। সবচে

BanglaInternet.com

জটিলতম যে বিষয়টি তাহলো প্রতিনিয়ত বিকাশমান সম্ভাবনার ক্ষেত্র। মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কি না, ভেনাসের বরফ কত দিনের, সূর্য কবে মারা যাবে, কবে তার আলো ফুরিয়ে যাবে, তখন পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে যাবে কি না, মানুষ টাইম ট্রাভেল করতে পারবে কি না, এই গ্যালাক্সির বাইরে আর কি আছে - এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তরে অসীম সম্ভবনার দুয়ার খুলে যায়।

এই বইটা লেখার সময় সৌরমণ্ডলে বিশাল একটি পরিবর্তন ঘটে যায়। প্লুটো নামের গ্রহটিকে গ্রহের মর্যাদা থেকে বাদ দেয়া হয়। ফলে আমাদের একটি গ্রহের সংখ্যা একটি কমে যায়। তবে প্লুটোকে গ্রহ না বললেও, জানার সুবিধার্থে বিভিন্ন স্থানে প্লুটোকে অন্যান্য গ্রহের সাথে রাখা হয়েছে। তাতে অন্যান্য গ্রহের সাথে প্লুটোকে তুলনা করতে এবং বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হবে। প্লুটোর সত্যি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার একটি কল্পকাহিনী ছাপা হয়েছে - তার নাম *ভাবিয়া*। এই বইটি থেকে প্লুটো সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে।

বিজ্ঞানের বই লেখা একটা বেশ ঝামেলার কাজ। এটা লেখকের জন্য যেমন কষ্টের, তেমনি প্রকাশকের জন্য আরো বেশি যন্ত্রণাকর। প্রকাশকদের কাছে উপন্যাস বের করা খুব সহজ একটি কাজ। কিন্তু বিজ্ঞানের বইগুলো এমন নয়। এখানে প্রচুর ছবি থাকে। এবং সেগুলো সুন্দর করে সঠিক জায়গায় নির্ভুলভাবে বসানোর কাজটি বেশ সময় ও খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। বিভিন্ন বই ঘেঁটে এবং নিজে নিজে অনেকগুলো চিত্র তৈরী করলাম। কিন্তু সেগুলো মান সম্মতভাবে ছাপানো যাবে কি না, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। যদি মান ঠিক রাখতে হয়, তাহলে দাম বেড়ে যায়। আবার দাম বেড়ে গেলে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা সেটা কিনতে পারবে না। এদেশে এখনও কাগজ ও প্রকাশনার জিনিসপত্রের মূল্য আমাদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের ক্রয়সীমার বাইরে। বিষয়টি নিয়ে যখন প্রকাশক ফরিদ আহমেদের সাথে বসলাম, তিনি সাহস দিয়ে বললেন, আমরা মানটা ঠিক রাখি। তিনি পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে বললেন, আপনার যা খুশি করতে থাকেন, দেখা যাক কী হয়। আমি খরচের বহরটা জানি। তাই তাঁর কথায় কিছুটা সাহস পেলেও নিজেকে অনেক জায়গায় কম্প্রোমাইজ করতে হলো। এই বইটির প্রকাশনার পর যে অভিজ্ঞতা হবে সেটার উপর ভর করে বাকি বইগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এমন ঝামেলার একটি কাজে সহায়তা দেয়ার জন্য ফরিদ আহমেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটির অনেক ছবি ঠিক করার জন্য আমার সহকর্মী মাহবুবুর রহমান ভিক্টর অনেক কাজ করেছে। তার এই সহযোগিতা ছাড়া বইটি বের করা কঠিনতর হতো।

জাকারিয়া স্বপন
ধানমন্ডি, ঢাকা
২ জানুয়ারি ২০০৭

Banglainternet.com

মহাবিশ্ব

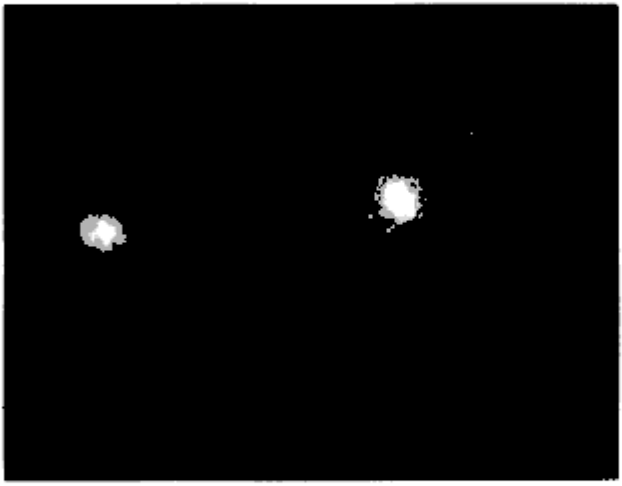

Banglainternet.com

মহাবিশ্ব

জন্মের পর থেকেই আকাশ সম্পর্কে মানুষের অগাধ আগ্রহ ছিল। মানুষ অবাক হয়ে আকাশ দেখে। এবং সেই আকাশ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ঠ আগ্রহের কারণে আমরা আকাশে কী দেখি তা নিয়ে বিভিন্ন রকমের গল্প ও মিথ তৈরী করেছি। আকাশের বিভিন্ন বস্তুকে পৃথিবীর দেব-দেবীর সাথে মিলিয়ে শত-সহস্র বছরের কালচার তৈরী হয়েছে। তবে আকাশে আমরা কী দেখি সেগুলো সাধারণভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য বিজ্ঞান এগিয়ে এসেছে, যা মূলত জোতির্বিদদের দ্বারা পরিচালিত (কসমোলজি)।

আকাশকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে জোতির্বিদরা বের করেছেন, কিভাবে পুরো বিশ্বমণ্ডল কাজ করছে। গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পরিলক্ষণ করে তারা বুঝতে পেরেছেন, এই পুরো মহাবিশ্বকে যে বস্তুটি ধরে আছে সেটা হলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এর ফলেই মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু একটি সিস্টেমের ভেতর থাকছে এবং ঘুরছে। আকাশ দেখার জন্য তৈরী হয়েছে টেলিস্কোপ। ফলে আমরা এখন নক্ষত্র, গ্যালাক্সি এবং মহাবিশ্বের আরো সব আজব আজব বস্তুকে দেখতে ও বুঝতে পারছি।

ধারণা করা হয় যে, মহাবিশ্বের বয়স হলো ১৩-১৪ বিলিয়ন বছর যা বেশির ভাগ জায়গা হলো শূন্যস্থান; আর টেলিস্কোপ দিয়ে যতটা দেখা যায় তাহলো বিন্দু বিন্দু

*আমাকে একটি খোলসের
ভিতরে আটকে রাখা হতে
পারে এবং আমি নিজেকে
অসীম মহাশূন্যের
রাজা ভাবতে পারি।*

*শেক্সপীয়ার
হ্যামলেট*

BanglaInternet.com

ফোটা দিয়ে টানা গ্যালাক্সি। মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে; ফলে গ্যালাক্সিগুলো ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের জন্ম ও এই বেড়ে চলার উপর সর্বজন স্বীকৃত যে তত্ত্বটি রয়েছে তার নাম 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব।

এখন পর্যন্ত সবচে দূরের যে গ্যালাক্সি ও কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে তা পৃথিবী থেকে ১০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। আমরা যতগুলো গ্যালাক্সি দেখতে পাই তার সবগুলোই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাশূন্যে আমরা যত গভীরভাবে দেখি, সেখানে দেখা যায় যে, দূরের গ্যালাক্সিগুলো দ্রুততর গতিতে আরো দূরে সরে যাচ্ছে।

বিগ ব্যাং কী?

এই মহাবিশ্ব নিয়ে সবচে' সাধারণ এবং বহুল আলোচিত প্রশ্ন হলো, এই মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে কিভাবে? অনেকেই মনে করেন যে, মহাবিশ্বের কোনও শুরু ও শেষ নেই, এবং এটি অসীম। তবে বিগ ব্যাং (Big Bang) তত্ত্বের উদ্ভাবনের পর থেকে মনে করা হয়, মহাবিশ্ব অসীম নয়, সসীম।

মহাবিশ্বের জন্ম নিয়ে একটি মতবাদ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এই মতবাদে বলা হয়েছে যে, এই মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে খুব বড় ধরনের একটি বিস্ফোরণ থেকে। এই বিস্ফোরণটির নাম হলো বিগ ব্যাং। অনুমান করা হয়, ১৩ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর আগে এই বিস্ফোরণটি ঘটেছিল। এই বিস্ফোরণের পূর্বে পুরো বস্তু ও শক্তি একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। বিজ্ঞানীরা বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে এটাকে বুঝার চেষ্টা করছেন। এবং দুটো ঘটনা থেকে এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, এডউইন হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে, এই মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট হারে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এবং দূরের বস্তুগুলো বেশি বেগে দূরে সরে যাচ্ছে। এই আবিষ্কারের পর থেকেই মূলত বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম হয় এবং এর কৃতিত্ব দেয়া হয় হাবলকে। দ্বিতীয়ত, মনে করা হয় যে, আমাদের এই পৃথিবীটি একটি বিশাল রেডিয়েশনের মধ্যে গোসল করে এসেছে। এটা যেন ছিল একটি আগুনের গোলাপিণ্ড। এই রেডিয়েশন সম্পর্কে নিশ্চিত প্রমাণ করেন দুজন বিজ্ঞানী - আর্নো পেনজিয়াস (জন্ম ১৯৩৩ সাল) এবং রবার্ট উইলসন (জন্ম ১৯৩৬ সাল)। তারা দুজনই আমেরিকার বিখ্যাত 'বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে' কাজ করতেন। সময়ের বিবর্তনে সেই বিস্ফোরণ থেকে জন্ম নেয়া ক্লাম্প থেকে গ্যালাক্সি তৈরী হয়। ছোট আকারের ক্লাম্পগুলো তৈরী করে নক্ষত্র। একটি ক্লাম্পের অনেকগুলো অংশ মিলে তৈরী হয়েছে প্ল্যানেট - যেমন আমাদের সৌরজগৎ।

এই বিস্ফোরণের পূর্বে কী হয়েছিল সেটা আজো জানা যায়নি। ধরে নেওয়া হয় যে, এর আগে স্পেস ও সময়ের অস্তিত্ব ছিল না। এই বিগ ব্যাং থেকেই স্পেস ও সময়ের জন্ম হয়। এই বিস্ফোরণের পর থেকেই মহাবিশ্ব আলোর গতির চেয়েও দ্রুত গতিতে চারদিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও বিগ ব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তবে এটা মনে রাখতে হবে তত্ত্বগুলোও প্রতিনিয়ত সংশোধন করা হচ্ছে।

Banglainternet.com

এখন খুব সংগত কারণেই প্রশ্নটি আসে যে, বিগ ব্যাং-এর পর কী হলো? বিগ ব্যাং-এর পর প্রথম সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাংশের মধ্যেই গঠিত হয় এই মহাবিশ্বের। খুব প্রথম দিকে প্লাজমার সুপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওই সময় মহাবিশ্ব ছিল অতিরিক্ত উত্তপ্ত। ধীরে ধীরে মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকে এবং আরো বেশি দূরে সরে যেতে থাকে। তারপর কী করে সেখান থেকে এটমের জন্ম হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন রকমের ধারণা প্রচলিত আছে। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, বর্তমানের মহাবিশ্ব নিয়ে যত গবেষণা করা যায়, তার সৃষ্টি নিয়ে সঠিক তথ্য বের করা খুব মুশকিল। বেশিরভাগ তথ্যই বিভিন্ন ধারণার উপর নির্ভর করে তৈরী করা। আমাদের জ্ঞানের যত বেশি প্রসার হবে, এই বিষয়গুলো আরো বেশি সহজ হয়ে আসবে।

মহাবিশ্বের বয়স কত?

হাবল স্পেস টেলিস্কোপ থেকে সংগৃহীত সাম্প্রতিক ডাটা থেকে বলা যায় যে, এই মহাবিশ্বের বয়স আট বিলিয়ন বছর। কিছুকাল আগে মনে করা হতো, মহাবিশ্বের বয়স হলো ১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর। ফলে এই দুটো হিসাবের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। তবে পুরনো হিসেবে একটু ভুল আছে বলে মনে করা হয়। আগে মনে করা হতো, বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের পর থেকে মহাশূন্য একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে চলেছে। এই বেড়ে যাওয়ার হারকে বলা হয় 'হাবল কনষ্ট্যান্ট'।

$$\text{হাবল কনষ্ট্যান্ট} = \frac{\text{গ্যালাক্সি যে হারে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে}}{\text{গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব}}$$

পৃথিবী থেকে যে হারে গ্যালাক্সি দূরে সরে যাচ্ছে তাকে, গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব দিয়ে ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, সেটাই হলো হাবল কনষ্ট্যান্ট। এখন এই সংখ্যাটিকে উল্টে দিলে যে মান পাওয়া যাবে, সেটাই হলো মহাবিশ্বের বয়স।

$$\text{মহাবিশ্বের বয়স} = \frac{১}{\text{হাবল কনষ্ট্যান্ট}}$$

$$= \frac{\text{গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব}}{\text{গ্যালাক্সি যে হারে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে}}$$

এখানে গ্যালাক্সি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব এবং পৃথিবী থেকে গ্যালাক্সির দূরে সরে যাওয়ার হার নিয়ে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। এবং সকল বিজ্ঞানীরা এটাও মেনে নিচ্ছেন না যে, মহাবিশ্ব ঠিক একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মহাবিশ্বের বয়স নিয়ে প্রশ্নটি এখনও উন্মুক্ত রয়ে গেছে। এখনও সঠিকভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

Banglainternet.com

ব্ল্যাক হোল কী?

মহাবিশ্বে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানকার বস্তুকণা এতই ঘন যে এর ভেতর দিয়ে কিছুই যেতে পারে না। এমনকি আলোও প্রবেশ করতে পারে না। ১৯৬৭ সালে আমেরিকান পদার্থবিদ জন হুইলার এটার নাম দেন 'ব্ল্যাক হোল'।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি টেনিস বলকে আমরা বাতাসে ছুঁড়ে মারছি। এটা হাত থেকে যে গতিতে বেরিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে সেই গতি কমে আসবে। এবং এক সময় সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে আবার ফিরে আসবে। এবারে সেই বলটিকে যদি এমন জোরে ছুঁড়ে দেয়া হয় যে, বলটি আর কখনই ফিরে আসবে না, অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল এটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। যে গতিতে ছুঁড়লে পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠা যায়, সেই গতিতে বলে 'এসকেপ ভেলোসিটি' (escape velocity). পৃথিবীর জন্য এই গতির পরিমাণ হলো ৭ মাইল/সেকেন্ড। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ৭ মাইল বেগে চলতে পারলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে মহাশূন্যে চলে যাওয়া যেতে পারে। পৃথিবী আর কখনই টেনে ওই বস্তুটিকে নামিয়ে আনতে পারবে না।

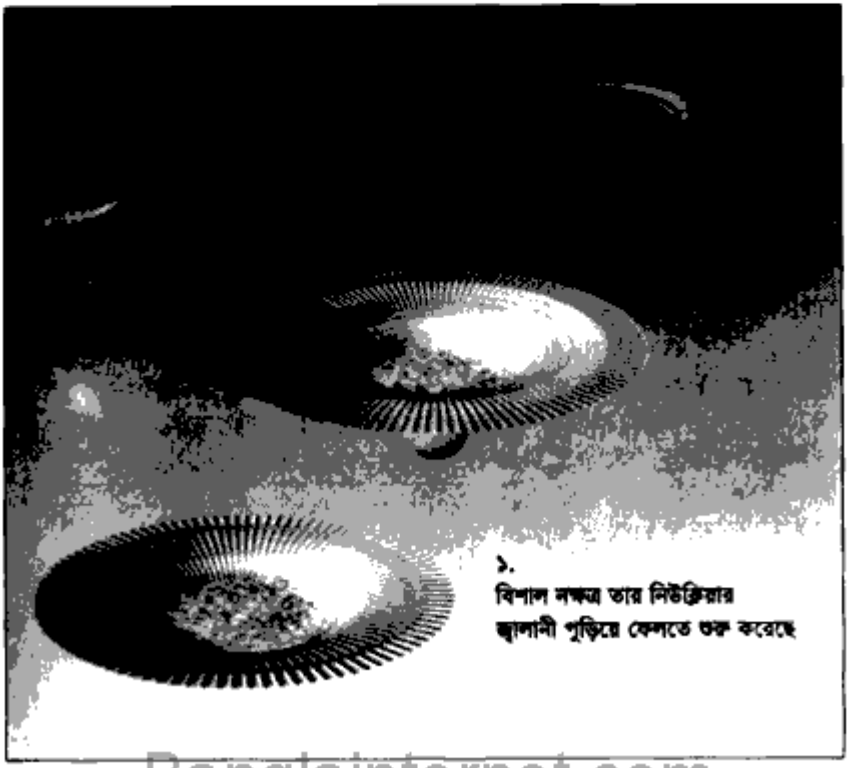

ব্লাকহোল গঠন প্রক্রিয়া

Banglainternet.com

এখন বস্তুটি যদি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে, তখন তার উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বাড়তেই থাকে। অর্থাৎ তার এসকেপ ভেলোসিটি বেশি হতে হবে। ফলে ক্ষুদ্র একটি বস্তুকে পৃথিবীর বাইরে পাঠাতে হলে আরো বেশি জোরে নিক্ষেপ করতে হবে। এভাবে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছানো যাবে যে, যখন আলোও মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে উঠতে পারবে না, যদিও আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। অন্যভাবে দেখলে, মহাবিশ্বে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানকার এসকেপ ভেলোসিটি আলোর গতির চেয়েও বেশি। ফলে আলোসহ আর কোনও কিছুই সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারেনা। আর যেহেতু আলোর চেয়ে দ্রুত গতির কিছু নেই, তাই কোনও কিছুই সেই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এটাই হলো ব্ল্যাক হোল।

ব্ল্যাক হোলের ভেতরে যেহেতু আলোও মুক্তি পায় না, তাই সরাসরি এটাকে দেখা যায় না। এটা কালো অন্ধকার। তবে ব্ল্যাক হোল যদি অন্য কোনও নক্ষত্রের পাশেই থাকে তাহলে ব্ল্যাক হোল সেই নক্ষত্র থেকে বিভিন্ন পদার্থ টেনে নেবে এবং ফলশ্রুতিতে একটি এক্স-রে তৈরী করবে।

যখন কোনও বড় আকৃতির নক্ষত্র তার সকল জ্বালানী পুড়িয়ে ফেলে তখন সেটা বিশাল বিস্ফোরণের মাধ্যমে সুপারনোভাতে পরিণত হয়। তারপর যে বস্তুগুলো রয়ে যায় তারা খুব ঘন আকারে থেকে যায়, যার নাম নিউট্রন ষ্টার। এই নিউট্রন ষ্টার যদি খুব বড় আকারের হয়, তখন সেটা জমে গিয়ে ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি ৩০০ বৎসরে একবার সুপারনোভা হয়; আর প্রতিবেশী গ্যালাক্সিগুলোতে প্রায় ৫০০ মতো নিউট্রন ষ্টার পাওয়া গেছে। তাই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, ওখানে কিছু ব্ল্যাক হোল থাকবেই।

এখানে একটি ব্ল্যাক হোল তৈরীর ছবি দেয়া হলো। এখানে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাইরের সাদা এলাকাটি হলো গ্যালাক্সি। কেন্দ্রের ভেতর খয়েরি স্পাইরাল ডিস্ক রয়েছে। এর ভর আমাদের সূর্যের ভরের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি। যেহেতু এটা ঘুরছে, তাই আমরা এর ব্যাসার্ধ, গতি এবং কেন্দ্রের ওজন পরিমাপ করতে পারি। বস্তুটি সূর্যের মতো বড়; কিন্তু ওজন সূর্যের চেয়ে ১,২০০,০০০, ০০০ গুণ বেশি। এর অর্থ হলো, এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সূর্যের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। ফলে এখান থেকে আলো বের হয়ে আসতে পারবে না।

মিল্কি-ওয়ে কী?

কোটি কোটি নক্ষত্র মিলে যে বিশাল একটি সিস্টেম তৈরী করে তাকে বলে গ্যালাক্সি। আমরা যে গ্যালাক্সিতে বসবাস করি তার নাম হলো মিল্কি-ওয়ে। রাতের আকাশকে ঘিরে এক ধরনের হালকা আলোর ব্যান্ড দেখা যায়। যে নক্ষত্রগুলো মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি তৈরী করেছে, এই আলো সে সকল নক্ষত্র থেকে আসে। এই আলোর ব্যান্ডকে বলে মিল্কি-ওয়ে। এই গ্যালাক্সিতেই সূর্য ও পৃথিবী রয়েছে। গ্যালাক্সি হলো

BanglaInternet.com

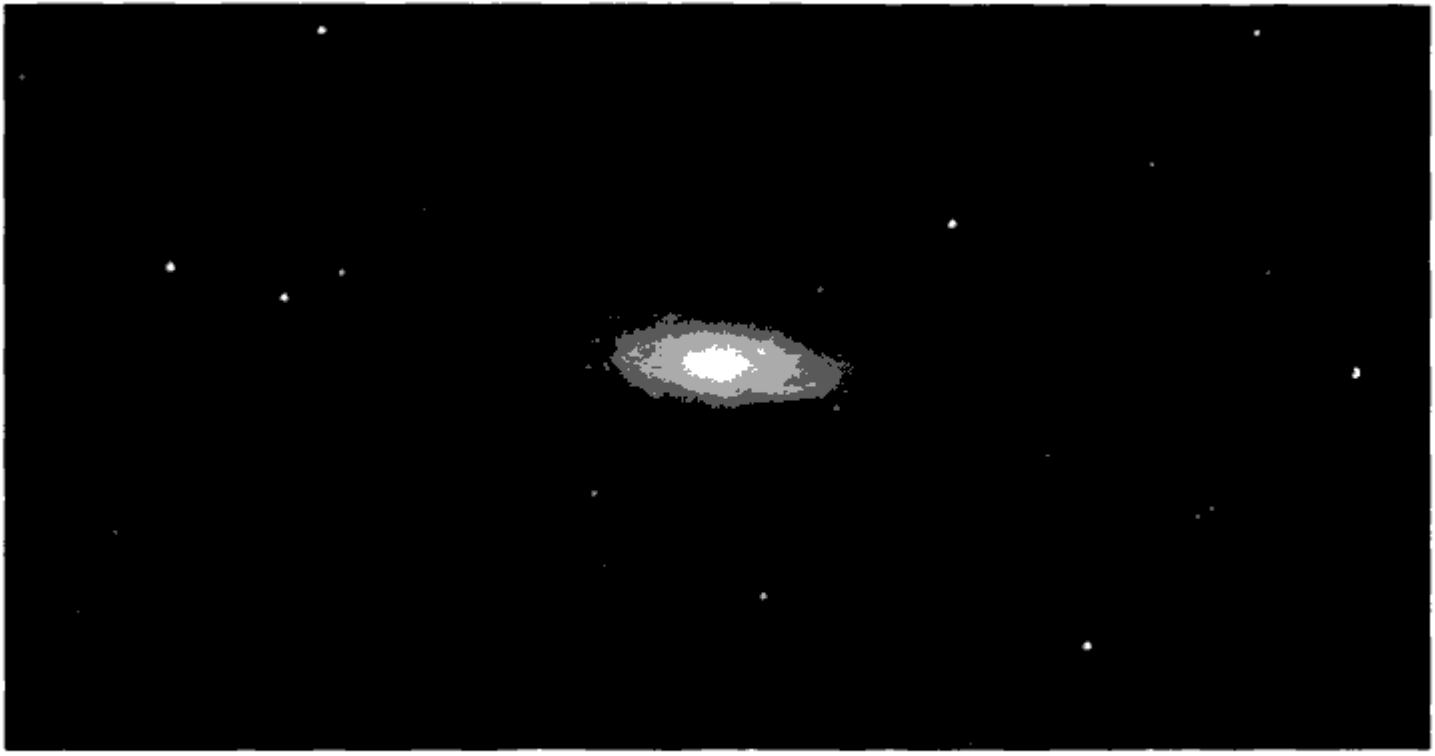

মিল্কি-ওয়ে : আমরা যে গ্যালাক্সিতে বসবাস করি তার নাম হলো মিল্কি-ওয়ে

অনেক নক্ষত্রের সমারোহ; কিন্তু নক্ষত্রগুলো নিজেদের ভেতর অনেক দূরে অবস্থান করে (শূন্যস্থান)। জোতির্বিদরা মনে করেন, এই মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিতে অন্তত ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে এবং এর ব্যাস হলো ১০০,০০০ আলোক বর্ষ। গ্যালাক্সি হিসেবে মিল্কি-ওয়ে খুবই বিশাল। এর ভর ৭৫০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন সোলার ভর। গ্যালাক্সিগুলো দেখতে অনেকটা ফনোগ্রাফ রেকর্ড-এর মতো; মাঝে থাকে নিউক্লিয়াস আর রেখাগুলো স্পাইরাল হয়ে কেন্দ্র থেকে চারপাশে দূরে সরে গেছে। পুরো মহাশূন্যে এমন কয়েক কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে। যতদূর জানা যায়, জোতির্বিদ ডেমোক্রিটাস (৪৫০বিসি - ৩৭০ বিসি) প্রথম দাবি করেন যে এমন একটি গ্যালাক্সি রয়েছে, যেখানে অজস্র নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

'মিল্কি' শব্দটি এসেছে পৃথিবী থেকে দেখা যায় এমন সাদা আলোর ধূসর ব্যান্ড থেকে, যেখানে একটি গ্যালাক্টিক তলের উপর নক্ষত্র ও অন্যান্য বস্তু অবস্থিত। মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি আবার একটি লোকাল গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, যা ৩টি বড় ও ৩০টির বেশি ছোট গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত। এই দলের মধ্যে মিল্কি-ওয়ে হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম। সবচে বড় গ্যালাক্সিটি হলো এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি এম-৩১, যা ২.৯ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। তবে এখানে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, সবচে কাছের প্রতিবেশীগুলোকেও সবে মাত্র চিহ্নিত করা গিয়েছে। সবচে কাছের 'ক্যানিস মেজর ড্যুয়ার্ফ' গ্যালাক্সিটি আবিষ্কার হলো মাত্র ২০০৩ সালে, যার কেন্দ্র আমাদের থেকে ২৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, এবং গ্যালাক্সিগুলোর কেন্দ্র থেকে ৪৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে।

আমাদের সৌরজগত গ্যালাক্সির বাইরের দিকে অবস্থিত; কেন্দ্র থেকে ২৮,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। যে কারণে আকাশে চারদিকে একটি আলোকিত ব্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়। স্পাইরালের যে বাহুটির উপর সৌরজগত অবস্থিত তার নাম 'লোকাল আর্ম' বা 'অরিয়ন আর্ম'। এই অরিয়ন বাহুর ভেতরের দিকে রয়েছে স্যাগিটারিয়াস বাহু আর বাইরের দিকে রয়েছে পারসিয়াস বাহু। সূর্য কিংবা সৌরজগতকে একবার এই গ্যালাক্সির কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে অনুমানিক ২০০-২৫০ মিলিয়ন বছর সময় লাগবে। এই কক্ষপথে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো ২৫০কিমি/সে (১৫৫ মাইল/সে) গতিতে চলছে। অন্যান্য গ্যালাক্সির মতো মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিতেও বিভিন্ন সময়ে সুপারনোভা ঘটে থাকে, যা পৃথিবীকে থেকে মাঝে মাঝে দেখা যেতে পারে।

একটি মজার বিষয় হলো, আমরা যেহেতু এই গ্যালাক্সির ভেতর অবস্থান করছি এবং আমরা কখনই আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে নভোযান পাঠাইনি, তাই এই মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির কোনও ছবিও আমাদের কাছে নেই। তবে টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করে একটি ছবি আঁকতে পারি। আমরা এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি সেটা সুইডেনের জোতির্বিদ নাট লান্ডমার্ক ১৯৫০ সালে এঁকেছিলেন।

Banglainternet.com

তিন ধরনের গ্যালাক্সি

হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে আমরা মহাশূন্যের গভীরে পর্যবেক্ষণ করতে পারছি। সেখানে আমরা বিভিন্ন আকৃতির কোটি কোটি গ্যালাক্সি দেখতে পাই। প্রতিটি গ্যালাক্সি আবার অগনিত সংখ্যক নক্ষত্র ধারণ করছে, যাদেরকে ঘিরে আবার গ্রহপুঞ্জ রয়েছে।

গ্যালাক্সিগুলোকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ক). স্পাইরাল খ). **ইলিপ্টিকাল এবং গ). ইরেগুলার বা বিসম আকৃতির গ্যালাক্সি।**

স্পাইরাল গ্যালাক্সি

এই ধরনের গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলো চাকতির মতো একটি তলে থেকে চারদিকে ঘুরতে থাকে (প্রথম চিত্র)। আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে অবস্থান করছে স্পাইরাল গ্যালাক্সিতে। স্পাইরাল গ্যালাক্সির আরেকটি রূপ হলো **স্পাইরাল বার গ্যালাক্সি** (মাঝের চিত্র)।

ইলিপ্টিকাল গ্যালাক্সি

বেশিরভাগ গ্যালাক্সিগুলো হলো ইলিপ্টিকাল (তৃতীয় চিত্র)। অনেকেই মনে করেন যে, এমন আকৃতির কারণ হলো অনেকগুলো গ্যালাক্সি একত্রিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে বিশাল সংঘর্ষও হয়েছে। এগুলো স্পাইরাল গ্যালাক্সির তুলনায় বিশাল আকৃতির হতে পারে।

net.com

আমাদের সবচে কাছের গ্যালাক্সি কোনটি?

পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে অবস্থিত তার নাম মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সি থেকে সবচে কাছের গ্যালাক্সির নাম এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি। এটা পৃথিবী থেকে প্রায় ২.২ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। এই গ্যালাক্সিটি মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে অনেক বড় এবং এর আকৃতি হলো স্পাইরাল যা পৃথিবীর আকাশেও বেশ উজ্জ্বল।

মহাশূন্যে গতি কত?

আইনস্টাইনের বিশেষ 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' অনুযায়ী, মহাশূন্যে কোনও বস্তুর প্রকৃত গতি বলে কিছু নেই; কারণ সেখানে রেফারেন্স হিসেবে কোনও কিছু নেই। কোনও কিছুর গতি সব সময়ই মাপা হয় অন্য আরেকটি বস্তুর সাপেক্ষে।

এই তত্ত্বটি মনে রেখে, অনেক জোতির্বিদ মনে করেন যে মহাশূন্যে গ্যালাক্সির গতি হলো ৬০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড (যে গ্যালাক্সি থেকে এটা দেখা হচ্ছে, সেই গ্যালাক্সির সাপেক্ষে)। অতি সম্প্রতি এটাকে ধরা হয়েছে ১৩০ কিমি/সে. থেকে ১,০০০ কিমি/সে. সীমার মধ্যে। যদি ধরা হয়, মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি ৬০০কিমি/সে বেগে চলছে, তাহলে আমরা প্রতিদিন ৫১.৮৪ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিচ্ছি; কিংবা বছরে ১৮.৯ বিলিয়ন বছর পথ চলছি। এটাকে যদি তুলনা করা যায় তাহলে বলতে হবে, পৃথিবী থেকে প্লুটোর দূরত্ব যা, তার ৪.৫ গুণ আমরা প্রতি বছর পাড়ি দিচ্ছি। মনে করা হয় যে, মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি হাইড্রা কনষ্টেলেশন-এর দিকে সরে যাচ্ছে।

আমাদের গ্যালাক্সির প্রতিবেশী কারা?

আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি ৩৫টি গ্যালাক্সি আছে, তবে এর মধ্যে এন্ড্রোমেডা এবং ট্রায়াংগুলাম গ্যালাক্সি প্রধান দুটি গ্যালাক্সি। মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিকে ঘিরে রয়েছে কিছু ছোট বা ডুয়ার্ফ গ্যালাক্সি। এদের মধ্যে সবচে বড়টির নাম হলো 'লার্জ ম্যাগাল্যানিক ক্লাউড', যার ব্যাস হলো ২০,০০০ আলোক বর্ষ। ক্ষুদ্রতমগুলো হলো কারিনা ডুয়ার্ফ, ড্রাকো ডুয়ার্ফ এবং লিও-২ ডুয়ার্ফ, যাদের ব্যাস হলো মাত্র ৫০০ আলোক বর্ষ। অন্য যে ছোট গ্যালাক্সিগুলো আমাদের গ্যালাক্সির চারপাশে ঘুরছে সেগুলো হলো, স্মল ম্যাগাল্যানিক ক্লাউড, কানিস মেজর ডুয়ার্ফ (আমাদের সবচে কাছের), স্যাগিটারিয়াস ডুয়ার্ফ ইলিপ্টিক্যাল গ্যালাক্সি (পূর্বে মনে করা হতো, এটাই আমাদের সবচে কাছের), উর্সা মাইনর ডুয়ার্ফ, স্কাল্পটর ডুয়ার্ফ, সেক্সটান্স ডুয়ার্ফ, ফরম্যাক্স ডুয়ার্ফ এবং লিও ডুয়ার্ফ।

Banglainternet.com

গ্যালাক্সিগুলো কী একত্রিত হয়ে যেতে পারে?

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গ্যালাক্সিও ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সি মিল্কি-ওয়ে ১৩০ কিলোমিটার/ সেকেন্ড গতিতে আমাদের নিকটবর্তী গ্যালাক্সি এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির দিকে সরে যাচ্ছে। এবং আশা করা হচ্ছে যে, ৫-৬ বিলিয়ন বৎসরের মধ্যে দুটো গ্যালাক্সি একত্রিত হয়ে যাবে। গ্যালাক্সিদের এই ধরনের মিলে যাওয়াটা খুবই সাধারণ। তবে যেহেতু নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব একে অপরের থেকে অনেক বেশি, তাই দুটো গ্যালাক্সি একত্রিত হয়ে গেলেও বেশিরভাগ নক্ষত্র সংঘর্ষ থেকে বেঁচে যায়।

যদিও এমন কোনও প্রমাণ নেই যে, মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি অতীতে এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির মতো বিশাল কোনও গ্যালাক্সির সাথে মিলিত হয়েছিল কিনা, তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে, ছোট ছোট ডুয়ার্ফ গ্যালাক্সির সাথে একত্রিত হয়েছিল।

মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির মতো স্পাইরাল গ্যালাক্সিগুলো নতুন নতুন নক্ষত্রের জন্ম দিতে পারে। তবে ইলিপটিক্যাল গ্যালাক্সিগুলো নতুন নক্ষত্র তৈরীর জন্য তাদের যাবতীয় গ্যাস ইতোমধ্যেই ফুরিয়ে ফেলেছে। নক্ষত্র তৈরীর জন্য উপাদান অসীম নয়। যেহেতু নক্ষত্রগুলো হাইড্রোজেনকে নতুন ভারী পদার্থে পরিণত করে ফেলে, তাই এখানে খুব কম নতুন নক্ষত্র তৈরী হবে।

আগামী আরো ১০০ বিলিয়ন বছর ধরে এই নক্ষত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে ১০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে 'ষ্টেলার যুগ' (stellar age). তখন দীর্ঘতম আয়ুর ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রটিও ধূসর হতে শুরু করবে। ষ্টেলার যুগ শেষ হয়ে গেলে গ্যালাক্সিগুলো ঘন বস্তুতে পরিণত হবে, যেমন খয়েরি ডুয়ার্ফ, কালো ডুয়ার্ফ, সাদা ডুয়ার্ফ, নিউট্রন নক্ষত্র এবং ব্ল্যাক হোল। তখন যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে, ফলে সকল নক্ষত্র একটি বিশাল আকারের ব্ল্যাক হোলে (supermassive black hole) পরিণত হতে পারে।

নেবুলা কী?

সাধারণভাবে বললে, নেবুলা হলো ধূলা, গ্যাস ও প্লাজমার মেঘ যার সাথে রয়েছে নক্ষত্রমালা। প্রাথমিকভাবে নেবুলা বলতে মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির বাইরের বর্ধিত যেকোনো বস্তুকে বুঝানো হতো। যেমন অনেক সময় এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিকে এন্ড্রোমেডা নেবুলা হিসেবে ধরা হতো। মহাশূন্যে নেবলা হলো সেই এলাকা যেখানে নক্ষত্রগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিকিরণের ধরনের উপর নির্ভর করে নেবুলাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

ডিফুউজ নেবুলা:

এই নেবুলা আলো বিকিরণ করে থাকে। এদের ভেতর আবার দুটো ভাগ রয়েছে -

BanglaInternet.com

ইমিশন নেবুলা ও রিফ্লেকশন নেবুলা। ইমিশন নেবুলা থাকে আয়নযুক্ত গ্যাসের মেঘ, যা থেকে আলো বেরিয়ে আসে। আর রিফ্লেকশন নেবুলাও আলো ছড়িয়ে থাকে, তবে সেই আলো আসে নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে। এই নেবুলা শুধু আলোর প্রতিফলন করে।

প্লানেটারি নেবুলা:
মৃত নক্ষত্রের চারপাশে ঘন গ্যাসের আবরণ দিয়ে তৈরী হয় প্লানেটারি নেবুলা।

সুপারনোভা রেমন্যান্ট:
এই নেবুলা খুব দ্রুত গতিতে তার জন্মদানকারী নক্ষত্রগুলো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এবং যে সকল ধুলা ও গ্যাস ধীরগতিতে চলছে তাদের সাথে ধাক্কা লেগে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে।

ডার্ক নেবুলা:
এই নেবুলা কোনও কিছু বিকিরণ করে না। ফলে এদেরকে বুঝা যায় না। এরা যখন কোনও নক্ষত্র বা অন্য কোনও নেবুলাকে ছেয়ে ফেলে তখন এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

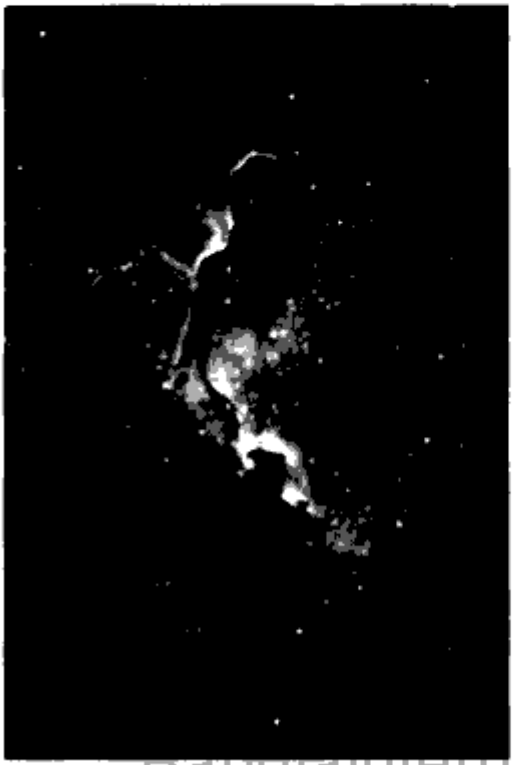

নেবুলা

ইমিশন নেবুলার একটি প্রধান শাখা হলো 'এইচ-টু রিজিয়ন'। এই অঞ্চলটিই হলো নক্ষত্রদের জন্মস্থান। নিকটবর্তী কোনও সুপারনোভা বিস্ফোরিত হলে মলিকুলার মেঘগুলো ভেঙ্গে যেতে থাকে। এবং এরা শত শত নক্ষত্রের জন্ম দেয়। এই নতুন জন্মপ্রাপ্ত নক্ষত্রগুলো পারিপার্শ্বিক গ্যাসকে আয়নযুক্ত করে ফেলে এবং তাতে ইমিশন নেবুলা তৈরী হয়।

অন্যান্য নেবুলাগুলো তৈরী হয়েছে নক্ষত্রের মৃত্যু থেকে। একটি নক্ষত্র যখন সাদা ডুয়ার্ফে পরিণত হতে থাকে, তখন তার বাইরের অংশ বিস্ফোরিত হয়ে প্ল্যানেটারি নেবুলা তৈরী করে। নোভা ও সুপারনোভাও নেবুলা তৈরী করতে পারে, যাদেরকে

BanglaInternet.com

বলা হয় যথাক্রমে নোভা রেমন্যান্ট এবং সুপারনোভা রেমন্যান্ট।

এই পৃথিবী এবং সৌরজগত যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম হলো সোলার নেবুলা। ধারণা করা হয় যে, নেবুলা খুব ধীর গতিতে ঘুরে এবং মাধ্যাকর্ষণের জন্য ধীরে ধীরে ভেঙ্গে যায়; এবং এক সময় নক্ষত্র ও গ্রহমণ্ডল তৈরী হয়। ১৭৫৫ সালে প্রথম এই ধারণার কথা বলেন ইমানুয়েল কান্ট। পরবর্তীতে ১৭৯৬ সালে একই ধরনের কথা বলেন পিয়ের-সিমন ল্যাপলাস।

সুপারনোভা কী একটি নক্ষত্রের মৃত্যু?

সুপারনোভা হলো মহাশূন্যের বস্তুকণার মধ্যে এক ধরনের বিস্ফোরণ যা প্লাজমার অতি উজ্জ্বল বস্তু তৈরী করে এবং কয়েক সপ্তাহ বা মাসের মধ্যেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি নক্ষত্রের জীবন শেষে এই বিস্ফোরণের জন্ম হয়, যখন নক্ষত্রটির সব শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই বিস্ফোরণটিকেই বলে সুপারনোভা। যদি নক্ষত্রটি খুব বড় আকারের হয়, তাহলে সেটা কেন্দ্রে জমাট বাঁধতে থাকে। এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বেশ কয়েক ধরনের সুপারনোভা হতে পারে, তবে মূলত দুটো উপায়ে এদের জন্ম হতে পারে।

টাইপ-২

যখন কোনও নক্ষত্র তার কেন্দ্র থেকে ফিউশন এনার্জি তৈরী করা বন্ধ করে দেয় এবং তার নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণের জন্য কেন্দ্রে গিয়ে জমা হতে থাকে, তখন একটি সুপারনোভা তৈরী হতে পারে।

টাইপ-১এ

আবার একটি সাদা ডুয়ার্ফ নক্ষত্র নিকটবর্তী নক্ষত্র থেকে বিভিন্ন বস্তু নিয়ে তার 'চন্দ্রশেখর লিমিট'-এ পৌছাতে পারে এবং একসময় থার্মো-নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ হতে পারে। তখন আরেক ধরনের সুপারনোভার জন্ম হতে পারে।

দুটো উপায়েই যখন সুপারনোভা তৈরী হয়, তখন প্রচণ্ড শক্তির বিস্ফোরণ ঘটে, যা পার্শবর্তী মহাশূন্যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি করে এবং সুপারনোভা রেমন্যান্ট তৈরী হয়।

নোভা একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ হলো 'নতুন'। এটাকে নতুন কোনও খুব উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বুঝানোর জন্য নোভা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এর সাথে 'সুপার' শব্দটি যোগ করা হয়েছে এর মাত্রাকে বাড়ানোর জন্য, যা সাধারণ নোভা থেকে আরো বেশি উজ্জ্বল এবং এই উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এখানে একটি ভুল বুঝার সুযোগ রয়েছে। সুপারনোভা কিন্তু নতুন কোনও নক্ষত্র তৈরী করে না, উপরন্ত এটা একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে বলে দেয়। সুপারনোভার মাধ্যমে একটি নক্ষত্র মারা যেতে পারে, নয়তো অন্য কোনও কিছুতে রূপ নিতে পারে।

যদিও পার্শ্ববর্তী গ্যালাক্সিতে অনেক সুপারনোভা পরিলক্ষিত হয়েছে, তবে

BanglaInternet.com

আমাদের নিজেদের গ্যালাক্সিতে এটা খুবই বিরল ঘটনা। তবে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি সুপারনোভা দেখা গেছে। পৃথিবী থেকে যখন এদেরকে দেখা গেছে সেই সময়কাল নিচে দেয়া হলো। তবে প্রকৃত অর্থে সুপারনোভাটি ঘটেছে আরো আগে; কারণ সুপারনোভার দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে হাজার হাজার আলোকবর্ষ। তাই সেখান থেকে আলো এসে পৌছাতে বিভিন্ন রকম সময় লাগতে পারে।

- ১০০৬ - এস.এন (সুপার নোভা) ১০০৬ : ১০০৬ সালে লিউপাস কনষ্টেলেশনে দেখা যায় অতি উজ্জ্বল এক সুপারনোভা। মিশর, ইরাক, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, চীন, জাপান এবং সম্ভবত ফ্রান্স ও সিরিয়া থেকে দেখার নমুনা পাওয়া যায়।
- ১০৫৪ - এস.এন ১০৫৪ : চীনের জোতির্বিদরা এবং সম্ভবত নেটিভ আমেরিকানরাও এই 'ক্র্যাব নেবুলা' জন্মের কথা লিখে গেছেন।
- ১১৮১ - এস.এন ১১৮১ : চীন ও জাপানের জোতির্বিদরা ক্যাসিওপিয়া কনষ্টেলেশনে এই সুপারনোভা দেখতে পান।
- ১৬০৪ - এস.এন ১৬০৪ : অফিউচাস কনষ্টেলেশনে মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি থেকে দৃশ্যত সবচে বড় এই সুপারনোভাটি দেখেন জোহানেস কেপলার।
- ১৮৮৫ - সুপার এন্ড্রোমেডা : এটা এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে আবিষ্কার করেন আর্নষ্ট হার্টউইগ।
- ১৯৮৭ - এস.এন ১৯৮৭এ : 'বৃহৎ ম্যাগেলানিক' মেঘে সৃষ্টি হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এটা পৃথিবীর মানুষের কাছে দৃশ্যত হয়। সুপারনোভা সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বের প্রমাণের জন্য এটাই ছিল প্রথম সুযোগ।

শেষবার এই ধরনের একটি বিস্ফোরণ ঘটেছিল ৪০০ বছর আগে; আর পরবর্তী সুপারনোভা দেখতে আরো ৩০০ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ক্র্যাব নেবুলা কী?

৪ জুলাই ১০৫৪ এ.ডি, চীনের জোতির্বিদরা লিখে গেছেন যে, তখন 'টাওরাস' কনষ্টেলেশনে একটি 'অতিথি নক্ষত্র' দেখা গেছে। ৫৩২ বি.সি থেকে ১০৬৪ এ.ডি পর্যন্ত চীনের জোতির্বিদরা এই ধরনের ঘটনাগুলো বর্ণনা করে গেছেন। সেই বর্ণনা অনুযায়ী, এই নক্ষত্রটি পূর্ণ উজ্জ্বলতার সময় ভেনাস থেকে ৪ গুণ উজ্জ্বল হয়েছিল, এবং এমনকি দিনের আলোতেও ২৩ দিন ধরে দেখা গিয়েছে। এই অতিথি নক্ষত্রটিই আসলে ক্র্যাব নেবুলা (এস.এন ১০৫৪)।

পুরনো আরো তথ্য-প্রমাণে পাওয়া যায় যে, এই সুপারনোভাটি পূর্ণ চাঁদের মতোই উজ্জ্বল ছিল। একই বিষয়ের অবতারণা পাওয়া যায় আনাসাজি ইন্ডিয়ান (বর্তমানে আমেরিকার এরিজোনা ও নিউ মেক্সিকো রাজ্য) শিল্পীদের চিত্রকর্মে। সিমন মিটন তার বই 'দি ক্র্যাব নেবুলা'-তে প্রমাণ দিয়ে লিখেছেন যে, ৫ জুলাই, ১০৫৪

BanglaInternet.com

সাল সকালে চাঁদটি সুপারনোভার খুব কাছে চলে এসেছিল। এবং বলা হয়েছে, এটা শুধু মাত্র উত্তর আমেরিকা থেকেই দেখা গিয়েছে।

১৯৯০ সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাঙ্ক রবার্ট রবিন্স আমেরিকার নিউ মেক্সিকো রাজ্যের মিম্বার্স ইন্ডিয়ানদের থালা-বাসনে আরো কিছু প্রমাণ পান। একটি থালায় সুপারনোভার চিত্র পাওয়া যায়। লেখক বলেন যে, এই ধরনের চিত্রকর্মের প্রচলন ১১০০ এ.ডি-র আগে ছিল। এবং থালাটির কার্বন-১৪ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ওটা ১০৫০ থেকে ১০৭০ এডি সালের মধ্যে বানানো হয়েছিল। তবে এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে, ইউরোপ ও আরবদের কোনও নমুনা এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত নেই যেখানে এই সুপারনোভা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তবে চীনা জোতির্বিদদের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, এটা ৪ জুলাই ১০৫৪ থেকে ১৭ এপ্রিল ১০৫৬ পর্যন্ত (৬৫৩ দিন) অন্তত চীন থেকে দেখা গিয়েছিল। এবং প্রথম দুই মাস এটার রঙ ছিল হলুদ।

তবে ৪ জুলাই ১০৫৪ সালের দিনটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, চীনা জোতির্বিদরা হয়তো আবহাওয়ার কারণে প্রথম দিনই সুপারনোভাটি দেখতে পায়নি। তবে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণায় চীনাদের এই তারিখটিকেই সুপারনোভা এস.এন-১০৫৪-এর তারিখ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

সাইজিজি কী?

যখন তিনটি সেলেষ্টিয়াল বস্তু একটি সরল রেখায় অবস্থান করে তখন একটি সাইজিজি তৈরী হয়। যেমন সূর্য, পৃথিবী এবং চাঁদ চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের সময় সাইজিজি অবস্থানে থাকে।

ডার্ক ম্যাটার কী?

বিষয়টি পুরোপুরিই তাত্ত্বিক। সত্যিকার অর্থে কিছু আছে কি না সেটা প্রমাণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব নয়। আধুনিক কসমোলজির তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্বের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ভর হলো এই ডার্ক ম্যাটার (বা কালো বস্তু) যা এখনও পুরোপুরি উদ্ধার করা যায়নি। আধুনিক কসমোলজি দিয়ে বিভিন্ন গ্যালাক্সির ভর পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে প্রত্যাশিত মান থেকে বিশাল গরমিল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, এমন কিছু একটা বস্তু বিশাল পরিমাণে রয়েছে যা হিসাবে আনতে হবে; কিন্তু বস্তুটা আসলে কী সেটা এখনও নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না। গ্যালাক্সির চলাচলে মাধ্যাকর্ষণের বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো বর্তমানে ঠিক মতো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। সেখানে যদি তাত্ত্বিকভাবে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব ধরে নেয়া যায়, তাহলে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করা সহজতর হয়ে উঠে।

BanglaInternet.com

কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার ঠিক কী দিয়ে তৈরী সেটা পরিষ্কার করে বলা না গেলেও, ধরে নেয়া হচ্ছে এটাতে রয়েছে অজানা পারমাণবিক কণা (শীতল ডার্ক ম্যাটার) অথবা দ্রুত গতিতে চলমান নিউট্রিনস (গরম ডার্ক ম্যাটার), কিংবা দুটোর মিশ্রণ। আবার অনেকেই মনে করেন যে, মহাশূন্যে যে পরিমাণ ভর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না (অর্থাৎ যে পরিমাণ ভর হওয়ার কথা, সেই পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে না) সেটা লুকিয়ে রয়েছে অতিরিক্ত ঘন বস্তু যেমন ব্ল্যাক হোলে।

১৯৯৩ জোতির্বিদরা এই ডার্ক ম্যাটারের কিছু অংশ আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। তারা মনে করেন ডার্ক ম্যাটারের কিছু অংশ হলো ব্রাউন ডুয়ার্ফ এবং সম্ভবত এমন কিছু নক্ষত্র যেগুলোতে আগুন ধরতে পারেনি। এই বস্তুগুলোকে বলা হয় মাচো (MACHO- Massive Astrophysical Compact Halo Objects; ম্যাসিভ এস্ট্রোফিজিকাল কম্প্যাক্ট হ্যালো অবজেক্ট) এবং মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সির প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ডার্ক ম্যাটার এই মাচো দিয়ে গঠিত।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে একটি গ্যালাক্সিতে ডার্ক ম্যাটারের বিশদ মানচিত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। একটি আন্তর্জাতিক জোতির্বিদদের দল এই মহাবিশ্বের এখন

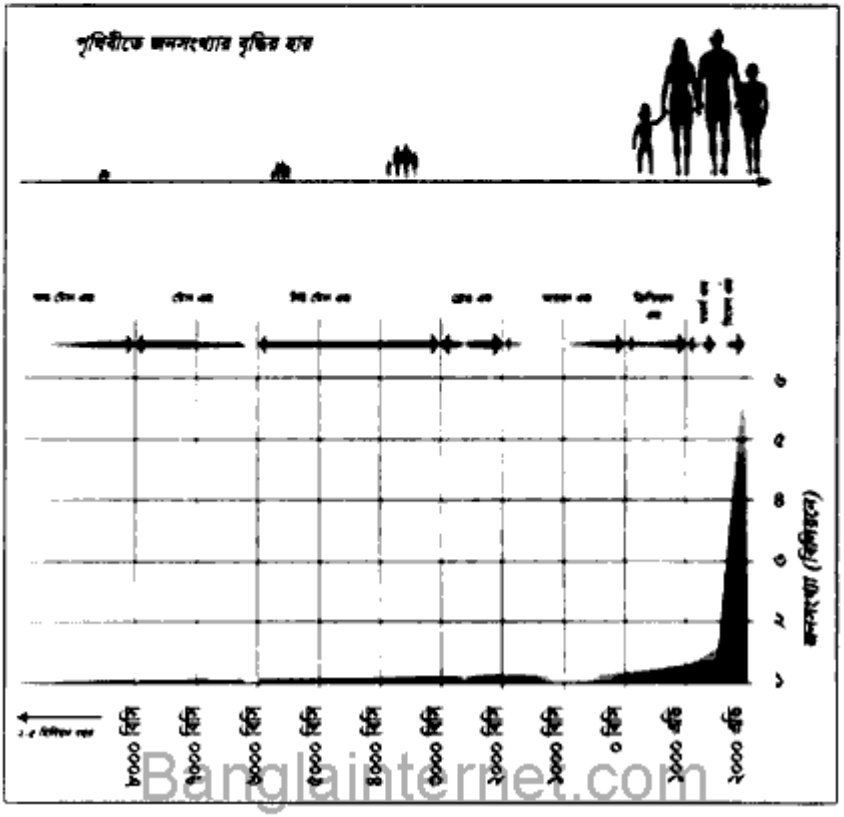

Banglainternet.com

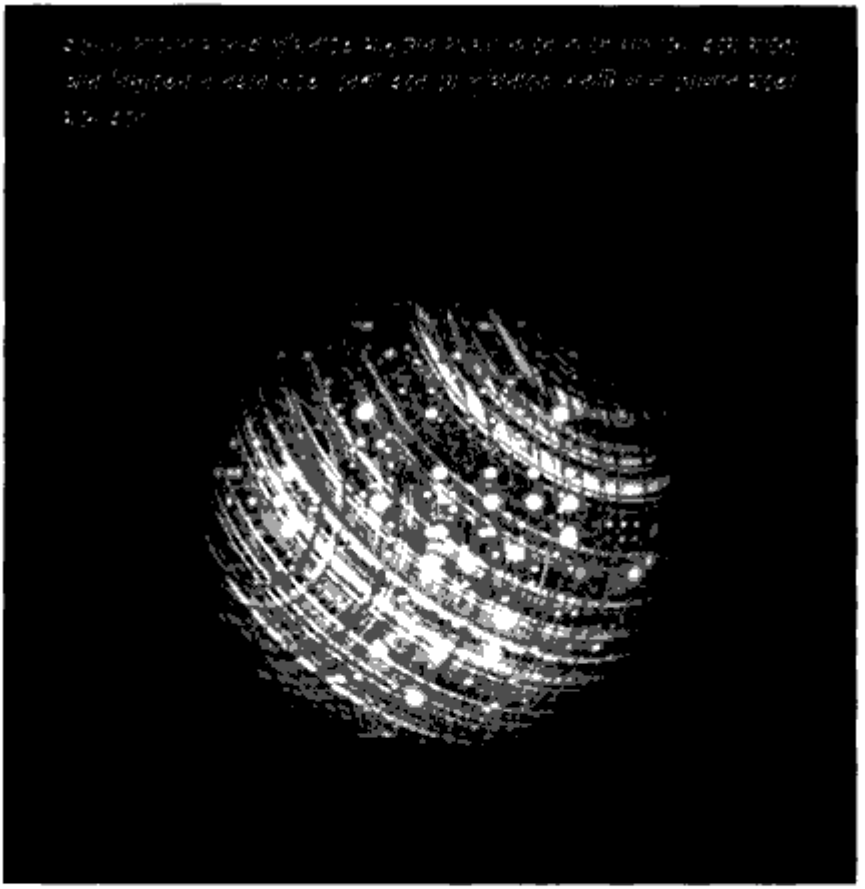

পর্যন্ত জানামতে সবচে বৃহৎ গ্যালাক্সি *সি.এল০০২৪+১৬৫৪* পর্যবেক্ষণ করেন। এই কাজে তারা হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করেন। বস্তুগুলোর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ওই গ্যালাক্সিটির বিশাল একটি অংশ এই ডার্ক ম্যাটার দিয়ে ঘেরা। গবেষকরা ওই ক্লাষ্টারের মধ্যে ৩৯টির মতো অঞ্চল নির্ণয় করেন। এবং ডার্ক ম্যাটারের কারণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির যে পরিবর্তন ঘটছে সেটা প্রমাণ করেন। জোতির্বিদরা যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই প্রথম একটি গ্যালাক্সি ক্লাষ্টারের ডার্ক ম্যাটারের মানচিত্র আঁকতে সমর্থ হয়েছেন।

Banglainternet.com

নক্ষত্র

Banglainternet.com

নক্ষত্র

নক্ষত্র হলো মহাবিশ্বে অবস্থিত প্লাজমা দিয়ে তৈরী বিশাল আকারের বস্তু, যেগুলো এখনও নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি ছড়াচ্ছে কিংবা ছড়িয়েছে। নক্ষত্রের রয়েছে প্রচণ্ড তাপ, এবং এই তাপ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু গ্রহদের নিজের কোনও আলো নেই।

নক্ষত্ররা তাদের জীবনের শতকরা ৯০ ভাগ সময় ব্যয় করে হাইড্রোজেন ফিউশনে, যার মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রায় হিলিয়াম তৈরী হয়। ছোট নক্ষত্রগুলো (যাদেরকে আবার বলা হয় রেড ডুয়ার্ফ) খুব ধীরে তাদের জ্বালানী পুড়িয়ে ফেলে এবং কয়েক বিলিয়ন বছর টিকে থাকে। তাদের জীবনের শেষ দিকে আলোহীন হয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় ধূসর হয়ে ব্ল্যাক ডুয়ার্ফে পরিণত হয়। তবে বর্তমান মহাবিশ্বের বয়স হলো প্রায় ১৩ বিলিয়ন বছর। ছোট নক্ষত্রগুলোর জীবনকাল যেহেতু এই সময়ের চেয়েও বেশি, তাই এখনও কোনও ব্ল্যাক ডুয়ার্ফ তৈরী হয়নি।

বাইনারি ষ্টার কী?

বাইনারি ষ্টার হলো এমন দুটো নক্ষত্র যাদের একটি সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ বিন্দু থাকে। এই মহাশূন্যের যাবতীয় তারাগুলো হয়তো বাইনারি ষ্টার সিস্টেম নয়তো মাল্টিপল ষ্টার সিস্টেমের আওতাধীন। একটি মাধ্যাকর্ষণ বিন্দুকে ঘিরে যদি দুইয়ের বেশি তারা থাকে তাহলে সেটা হলো মাল্টিপল ষ্টার সিস্টেম।

প্রায় ৮.৬ আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে উজ্জ্বল তারা সিরিয়াস। এটা আসলে দুটো তারা মিলে একটি তারা। এর একটি হলো সূর্যের চেয়ে প্রায় ২.৩ গুণ ভারী, আর অন্যটি বৃহস্পতি থেকে ৯৮০ গুণ বেশি ভারী। পৃথিবী থেকে সবচে কাছের নক্ষত্র হলো সূর্য। তার পরের নক্ষত্র হলো আলফা সেনচুয়ারি। কিন্তু এটি মূলত তিনটি তারার সম্মিলন : আলফা সেনচুয়ারি এ, আলফা সেনচুয়ারি বি এবং আলফা সেনচুয়ারি সি। প্রথম দুটো তারা হলো সূর্যের মতো।

Banglainternet.com

নক্ষত্রের রং দিয়ে কী বুঝায়?

একটি নক্ষত্রের রং দিয়ে বুঝা যায় তার তাপমাত্রা এবং বয়স কত। নক্ষত্রগুলোকে তাদের স্পেকট্রালের ধরণ দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বয়স্কতম থেকে তরুণ, আর গরমতম থেকে ঠাণ্ডাতম তারাগুলোর তালিকা নিচে দেয়া হলো :

ধরণ	রং	তাপমাত্রা
ও	নীল	২৫,০০০ - ৪০,০০০ সেন্টিগ্রেড
বি	নীল	১১,০০০ - ২৫,০০০ সেন্টিগ্রেড
এ	নীল-সাদা	৭,৫০০ - ১১,০০০ সেন্টিগ্রেড
এফ	সাদা	৬,০০০ - ৭,৫০০ সেন্টিগ্রেড
জি	হলুদ	৫,০০০ - ৬,০০০ সেন্টিগ্রেড
কে	কমলা	৩,৫০০ - ৫,০০০ সেন্টিগ্রেড
এম	লাল	৩,০০০ - ৩,৫০০ সেন্টিগ্রেড

প্রতিটি ধরণকে আবার ০ থেকে ৯ পর্যন্ত ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সূর্য হলো জি-২ ধরনের নক্ষত্র।

বিগ ডিপার কী?

বিগ ডিপার হলো সাতটি নক্ষত্রের একটি বিশেষ অবস্থান যখন তাদেরকে দেখতে একটি লম্বা হাতলওয়ালা চামচের মতো মনে হয়। এই নক্ষত্রের দলটি ইংল্যান্ডে প্লাউ নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধ থেকে এই বিগ ডিপারকে প্রায় সবসময়ই দেখা যায়। যখন অন্যান্য নক্ষত্রকে খুঁজে বের করতে হয়, তখন এই বিগ ডিপারকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। যদি বিগ ডিপারের দুই মাথার দুটো নক্ষত্রকে একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করা যায় তাহলে সেটা আরেকটি নক্ষত্র 'পোলারিস' বরাবর যায়। এটা হলো নর্থ ষ্টার।

নর্থ ষ্টার কোথায়?

উত্তর গোলার্ধ থেকে মহাশূন্যের দিকে যদি একটি কাল্পনিক রেখা টানা যায় তাহলে সেটি একটি নক্ষত্র পর্যন্ত যাবে, যার নাম পোলারিস। একেই বলে নর্থ ষ্টার। যেহেতু পৃথিবী তার নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরে, তাই পোলারিসকে দেখে মনে হবে সেটাই হলো পিভট-পয়েন্ট (যার চারদিকে সব কিছু ঘুরছে)। এবং উত্তর গোলার্ধ থেকে যত নক্ষত্র দেখা যায় সবাই যেন পোলারিসকে ঘিরে ঘুরছে; আর পোলারিস যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

Banglainternet.com

সামার ট্রায়াঙ্গল কী?

গ্রীষ্মকালে মিল্কি-ওয়েতে তিনটি নক্ষত্র ডেনেব, ভেগা ও আল্টেয়ার মিলে একটি ত্রিভুজের মতো আকৃতি তৈরী করে। এটাকেই বলে সামার ট্রায়াঙ্গল।

কতগুলো কনষ্টেলেশন আছে?

অনেকগুলো নক্ষত্র মিলে যখন বিশেষ কোনও আকৃতি ধারণ করে তখন তাদেরকে কনষ্টেলেশন বলে। এই আকৃতিগুলো হতে পারে মানুষের মতো, পশু-পাখির মতো কিংবা কোনও বস্তুর মতো। এদেরকে শুধুমাত্র ওই আকৃতিগুলো তৈরীর সময়ই দেখা যায়-এবং এগুলো পৃথিবীর কাছাকাছি। এরা নিজেরা হয়তো একে অপর থেকে অনেক বেশি দূরে অবস্থান করছে। ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক এস্ট্রোনোমিকাল ইউনিয়ন ৮৮টি দৃশ্যমান কনষ্টেলেশন চিহ্নিত করে তাদের সীমানা ও আকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতি থাকায় এই কনষ্টেলেশনের নামগুলোও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তবে বর্তমান প্রযুক্তিগত বিকাশ যেহেতু পশ্চিমা দেশগুলো দ্বারা প্রভাবিত তাই অনেক কনষ্টেলেশনের নামগুলো গ্রিক ও রোমান মিথলোজি থেকে এসেছে। যেমন কয়েকটি কনষ্টেলেশনের নাম হলো হারকিউলিস, হাইড্রা, ইন্ডাস, লিও, লিবরা, ওরিয়ন, স্যাগিটারিয়াস, ভার্গো ইত্যাদি।

হাইড্রা হলো সবচে বড় কনষ্টেলেশন। লম্বা এক লাইনে অনেকগুলো তারাকে এক সাথে দেখা যায়। পুরনো মিথলোজিতে হারকিউলিস একটি বৃহৎ মনষ্টার ধরণের পানি-সাপকে মেরে ছিল, যার নাম ছিল হাইড্রা। সেই থেকে কনষ্টেলেশনের নাম রাখা হয় হাইড্রা।

পৃথিবী থেকে সবচে কাছের নক্ষত্র কোনটি?

পৃথিবী থেকে সবচে কাছের তারা হলো সূর্য। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৯,২৯,৫৫,৯০০ মাইল বা ১৪৯,৫৯৮,০০০ কিলোমিটার। সূর্যের পরে নিকটতম তারাগুলো হলো ত্রিপল ষ্টার সিস্টেমের সদস্য, যাদেরকে বলা হয় আলফা সেনচুয়ারি (আলফা সেনচুয়ারি এ, আলফা সেনচুয়ারি বি এবং আলফা সেনচুয়ারি সি)। কখনও এদেরকে প্রক্সিমা সেনচুয়ারিও বলা হয়ে থাকে। এরা ৪.৩ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত।

সূর্যের তাপমাত্রা কত?

সূর্যের কেন্দ্রে তাপমাত্রা হলো প্রায় ২৭,০০০,০০০° ফারেনহাইট বা ১৫,০০০,০০০° সেন্টিগ্রেড। আর সূর্যের চারিদিকের তলে বা ফটোস্ফেয়ারে তাপমাত্রা হলো ৫,৫০০° সেন্টিগ্রেড (১০,০০০° ফারেনহাইট)। সূর্যের সর্বশেষ স্তরটি হলো ক্রোমোস্ফেয়ার যা কয়েক হাজার মাইল পুরো। এখানে তাপমাত্রা হলো ৪,৩০০° সেন্টিগ্রেড।

BanglaInternet.com

সূর্য কী দিয়ে তৈরী?

সূর্য হলো মূলত বিভিন্ন গ্যাসের একটি বল। এর ভর হলো ১.৮X১০২৭ টন বা ১.৮ অক্টিলিয়ন টন। এটা পৃথিবী থেকে ৩,৩০,০০০ গুণ ভারী।

উপাদান	মোট ভরের %
হাইড্রোজেন	৭৩.৪৬
হিলিয়াম	২৪.৮৫
অক্সিজেন	০.৭৭
কার্বন	০.২৯
আয়রন	০.১৬
নিয়ন	০.১২
নাইট্রোজেন	০.০৯
সিলিকন	০.০৭
ম্যাগনেসিয়াম	০.০৫
সালফার	০.০৪
অন্যান্য গ্যাস	০.১০

সূর্য কবে মারা যাবে?

সূর্যের বয়স হলো ৪.৫ বিলিয়ন বৎসর। এখন থেকে আরও পাঁচ বিলিয়ন বৎসর পর সূর্যের সমস্ত হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামে পরিণত হয়ে যাবে। এই বিবর্তন ঘটলে সূর্য তার হলুদ রং থেকে লাল রঙে পরিণত হবে। মূলত এটি বিশাল আকৃতির একটি লাল পিণ্ডে পরিণত হবে। এর ব্যাস ভেনাস গ্রহের কক্ষপথকে ছাড়িয়ে তো যাবেই, এমনকি পৃথিবীর কক্ষপথকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সূর্যের রং পরিবর্তন হয় কেন?

মাঝে মাঝে সূর্যের রং পরিবর্তন হয়। সূর্যের আলো রঙধনুর সাতটি রং ধারণ করে। এবং সেই সাতটি রং এক সাথে মিলে যখন পৃথিবীতে পৌছায় তখন এটি সাদা দেখায়। একটা সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌছালে বিশেষ করে নীল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়ে ছড়িয়ে যায়। ফলে সূর্যের আলো সাদার পরিবর্তে রঙিন হয়ে ওঠে। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর থাকে, তখন এমনটা হতে পারে। এই সময়ে আকাশ নীল দেখায় আর সূর্য হলুদ হয়ে যায়। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলোকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচে বেশি পরিমাণ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হয়। এবং লাল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচে বেশি বলে এটা পৃথিবীতে সবচে বেশি চলে আসে। এবং

BanglaInternet.com

সেই সময় সূর্যকে লাল দেখায়। অন্যান্য রঙের আলোগুলো তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। আলোর গতি ১,৮৬,২৮২ মাইল/সেকেন্ড।

সোলার ইকলিপস কখন ঘটে?

চাঁদ হলো একটি পাথরের তৈরী ঠাণ্ডা বস্তু যার ব্যাস হলো ৩,৪৭৬ কিলোমিটার (২,১৬০ মাইল)। চাঁদের নিজের কোনও আলো নেই; কিন্তু সূর্যের আলো এর উপর পড়লে চাঁদের তল আলোকিত হয়। চাঁদ প্রতি সাড়ে ২৯ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ চলার পথে যখন সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থান করে এবং তিনটিই একই তলে অবস্থান করে তখন সোলার ইকলিপস বা সূর্যগ্রহণ ঘটে। চাঁদ যদি এমন একটা অবস্থানে চলে আসে যখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে একটুও দেখা যায় না, তাকে পূর্ণ গ্রহণ (টোটাল ইকলিপস) বলে। সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবীর কক্ষপথগুলোর মধ্যে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে এদের দূরত্ব সবচে কম। সংকীর্ণ এই স্থানটির দৈর্ঘ হলো ১০০ থেকে ২০০ মাইল। চাঁদ এই জায়গায় চলে এলে পূর্ণ গ্রহণ হবে। পূর্ণ গ্রহণের সময়কাল হয় গড়ে ২.৫ মিনিট। তবে কখনও এটা ৭.৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই সময় আকাশ একদম অন্ধকার হয়ে যায়, এবং তারা ও অন্যান্য প্ল্যানেটগুলো সহজেই দেখা যায়। সূর্যের সবচে বাইরের এটমসফেয়ার 'করোনা'ও এসময় দেখা যায়।

চাঁদ পৃথিবীর যত কাছে আসবে সেটা দেখতে তত বড় হবে। চাঁদ যদি যথেষ্ট বড় হয়ে দেখা না দেয়, তাহলে সেটা পৃথিবী থেকে সূর্যকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে চাঁদের চারপাশ দিয়ে সূর্যকে দেখা যাবে। এটাকে বলে এনুলার ইকলিপস। এই সময় সূর্যের করোনা দেখা যাবে না। আকাশ কিছুটা অন্ধকার হতে পারে। তবে তাতে তারা দেখা যাবে না।

সোলার ইকলিপস দেখার নিরাপদ উপায় কী?

খালি চোখে সরাসরি সূর্যগ্রহণ দেখা নিরাপদ নয়। চোখের রেটিনা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। একটি ইন্ডেক্স কার্ডে পিনহোল কর। তারপর আরেকটি ইন্ডেক্স কার্ড থেকে দু'তিন ফুট দূরে ধরে রাখ। কার্ডের সেই ফুটো দিয়ে নিরপদে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। তবে এলুমিনিয়াম মাইলার লেন্সের বিশেষ চশমা কিনতে পাওয়া যায়, যা দিয়েও নিরাপদে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য লেন্স যেমন ফটোগ্রাফিক ফিল্টার, এক্সপোজড ফিল্ম, ঘষা কাচ, ক্যামেরার লেন্স, টেলিস্কোপ কিংবা বাইনোকুলার দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখলে চোখের রেটিনার ক্ষতি হতে পারে।

Banglainternet.com

সূর্য গ্রহণ : নরওয়ে থেকে তোলা ছবি। চাঁদ ধীরে ধীরে সূর্যকে ঢেকে ফেলছে

সান ডগ কী?

সান ডগ হলো একটি মিথ্যা/ভূয়া সূর্য বা ২২° পারহেলিয়া। এটা হলো উজ্জ্বল আলোর স্পট যা মাঝে মাঝে সূর্যের দুই দিকেই একই দূরত্বে দেখা যায়। এগুলো সূর্য থেকে ২২° দূরে অবস্থান করে।

সোলার উইন্ড কী?

সূর্যের সবচে বাইরের এটমসফেয়ার হলো করোনা। এই করোনা স্তরে যদি গ্যাস ফেঁপে বেড়ে উঠে তাহলে সোলার উইন্ড তৈরী হয়। এই স্তরে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের অণু-পরমাণুগুলো সংঘাতে রূপ নিতে শুরু করে। অণুগুলো তাদের ইলেক্ট্রন হারিয়ে ফেলে এবং বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত আয়ণে পরিণত হয়। এই আয়ণগুলোই সোলার উইন্ড তৈরী করে। সোলার উইন্ড-এর গতি হয় সেকেন্ডে ৫০০ কিলোমিটার (৩১০ মাইল) এবং ঘনত্ব হলো প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫টি আয়ণ (প্রতি ঘন ইঞ্চিতে ৮২টি আয়ণ)। এই পৃথিবীর চারদিকে খুব শক্তিশালী চৌম্বক শক্তি রয়েছে (ম্যাগনেটোস্ফেয়ার), যা এই সোলার উইন্ডের কণা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ১৯৫৯ সালে রাশিয়ার মহাশূন্যযান লুনা-২ এই সোলার উইন্ডের সত্যতা দেখতে পায় এবং প্রথমবারের মতো সোলার উইন্ডের বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ নিতে সক্ষম হয়।

Banglainternet.com

রাতের আকাশের সব নক্ষত্র কি আমাদের গ্যালাক্সির?

খালি চোখে আমরা কেবলমাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পারি। এর মধ্যে বেশিরভাগই হলো কাছের নক্ষত্র এবং কিছু আছে দূরের উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু এগুলো হলো আমাদের গ্যালাক্সির ১০০,০০০,০০০,০০০ নক্ষত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। খুব শক্তিশালী টেলিস্কোপ ছাড়া আমরা অন্য গ্যালাক্সির নক্ষত্র দেখতে পাই না। আমাদের নিকটবর্তী উজ্জ্বলতম গ্যালাক্সি হলো এম-৩১ (এন্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি)। ওই গ্যালাক্সিতে আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কি-ওয়ে থেকে অনেক বেশি নক্ষত্র রয়েছে। এবং খালি চোখে ওই গ্যালাক্সিকেও মনে হবে অল্প সংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে।

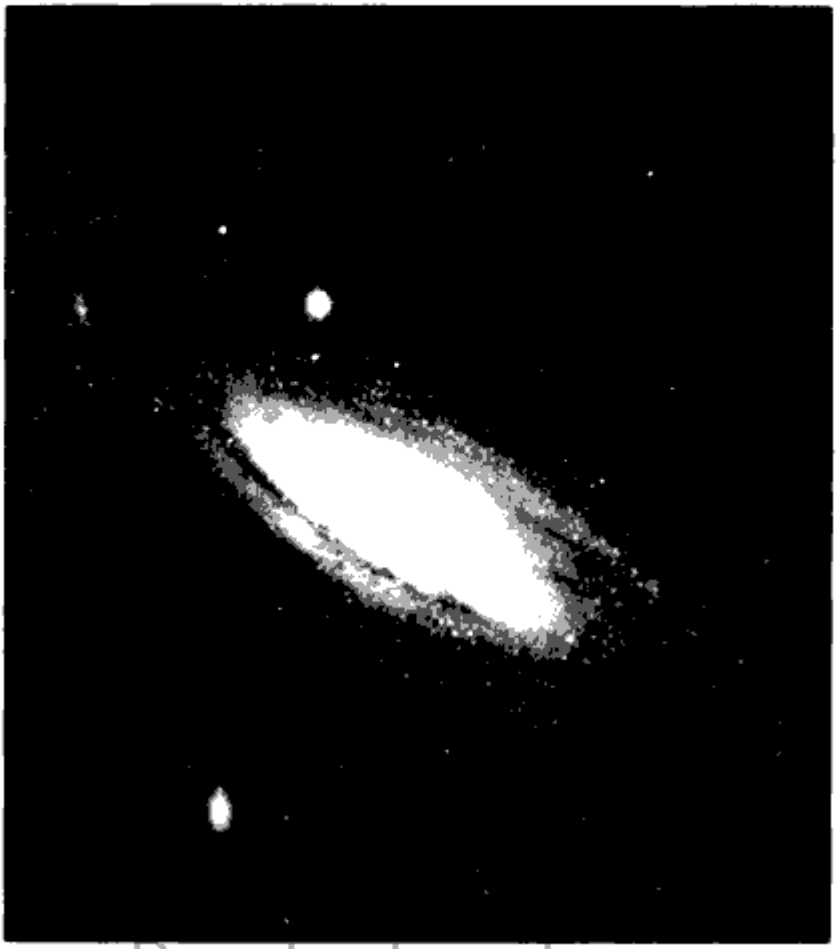

রাতের আকাশের সব নক্ষত্র কি আমাদের গ্যালাক্সির?

BanglaInternet.com

হোয়াইট ডুয়ার্ফ কী?

এটি হলো একটি নক্ষত্রের জীবদ্দশার সবচে শেষ অধ্যায়। তখন নক্ষত্রটি আকারে ছোট হয়ে যায়। যেমন সূর্য একটি নক্ষত্র। এটিও একসময় তাপ বিকিরণ করতে করতে যখন মারা যাবে, তার আগ মুহূর্তে হোয়াইট ডুয়ার্ফে পরিণত হবে। এই গ্যালাক্সির শতকরা ১০ ভাগ নক্ষত্র হলো হোয়াইট ডুয়ার্ফ, তবে বেশিরভাগই ওজনে সূর্যের ৬০% শতাংশ, কিন্তু ব্যাসার্ধ মাত্র সূর্যের ১% শতাংশ (পৃথিবীর আকারের মতো)।) বেশিরভাগের উপরিতলের তাপমাত্রা ৮,০০০° সেন্ট্রিগ্রেড বা আরো বেশি, যা সূর্যের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত। তবে এদের আকার খুব ছোট বলে উজ্জ্বলতা সূর্যের উজ্জ্বলতার ১% ভাগেরও কম। মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সি প্রায় ৫০ বিলিয়ন হোয়াইট ডুয়ার্ফ ধারণ করছে। বিলিয়ন বছর পর হোয়াইট ডুয়ার্ফ শীতল হয়ে যাবে।

কসমিক রেডিয়েশন কী?

মহাশূন্যে রয়েছে উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন কণার প্রবাহ এবং ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, যাদের মধ্যে রয়েছে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, আলফা কণা, আলোর নিউক্লিয়ার এবং গামা রশ্মি। এদেরকেই একত্রে বলে কসমিক রেডিয়েশন। নভোযানগুলো এই রেডিয়েশনের মাত্রা পরিমাণের জন্য তাদের সাথে একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র নিয়ে যায় যার নাম 'ডসিমিটার'।

অল্প শক্তির কসমিক রেডিয়েশনের উৎপত্তি হতে পারে সুপারনোভার বিস্ফোরণ বা পালসার থেকে; কিন্তু উচ্চ শক্তির কসমিক রেডিয়েশনের উৎপত্তি হতে পারে কোনও কোনও গ্যালাক্সি থেকে নির্গত জেট গ্যাস থেকে।

Banglainternet.com

সোলার সিস্টেম

Banglainternet.com

সোলার সিস্টেম

সূর্য, তাকে ঘিরে আটটি গ্রহ, এই গ্রহগুলোর ১৩০টির বেশি উপগ্রহ, অসংখ্য ক্ষুদ্র বস্তু (কমেট ও এস্টেরয়েড), এবং গ্রহ-উপগ্রহগুলোর মাঝের বিশাল খালি জায়গা নিয়ে সোলার সিস্টেম বা সৌরজগত গঠিত। তবে এর বাইরেও আরো অনেক উপগ্রহ থাকতে পারে, যা এখনও আবিস্কৃত হয়নি।

সৌরজগতকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইনার সোলার সিষ্টেমে রয়েছে সূর্য, মার্কারি, ভেনাস, আর্থ এবং মার্স। আর আউটার সোলার সিস্টেমে রয়েছে জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো (প্লুটোকে সাম্প্রতিককালে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে)। যেখানে ইনার সোলার সিস্টেম শেষ আর আউটার সোলার সিস্টেম শুরু, অর্থাৎ মার্স ও জুপিটারের মাঝখানে রয়েছে এস্টেরয়েড বেল্ট। বেশিরভাগ এস্টেরয়েড এখানে অবস্থিত।

তবে একটি বিষয় এখানে খেয়াল করতে হবে যে, সোলার সিস্টেমের বেশির ভাগ জায়গাই হলো শূন্যস্থান। গ্রহগুলোর নিজেদের মাঝের দূরত্ব বা শূন্যস্থানের

সূর্য ও আটটি গ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ

BanglaInternet.com

তুলনায় তাদের আকার খুবই ক্ষুদ্র।

গ্রহগুলো প্রত্যেকে সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার (ellipses) কক্ষপথে (orbit) ঘুরে। তবে মার্কারি ও প্লুটোর কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার। এবং প্রতিটি গ্রহের কক্ষপথই প্রায় একটি তলের উপর অবস্থিত। পৃথিবীর কক্ষপথ যে তলের উপর অবস্থিত, বাকী গ্রহগুলোর কক্ষপথও প্রায় একই তলের উপর অবস্থিত। এই তলকে বলে ইকলিপ্টিক (ecliptic). এই ইকলিপ্টিক তলটি সূর্যের ইকুয়েটরের তল থেকে মাত্র ৭ ডিগ্রি ঢালু। তবে প্লুটোর কক্ষপথটি এই তল থেকে কিছুটা বেশি ঢালু (১৭ ডিগ্রি)। সবগুলো গ্রহই একই দিক বরাবার (ঘড়ির কাঁটার দিকে) ঘুরছে।

সোলার সিষ্টেমের বয়স কত?

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সোলার সিস্টেম বা সৌরজগতের বয়স হলো ৪.৫ বিলিয়ন বৎসর। এই পৃথিবী এবং সৌরজগতের বাকী অংশসমূহ ঘনীভূত গ্যাসের মেঘ ও ধূলিকণা থেকে তৈরী হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও ঘূর্ণন শক্তির ফলে সেই মেঘ সমতল ডিস্কে পরিণত হয়েছে। এবং সেই মেঘের ভর কেন্দ্রে জমা হয়েছে। সেই বস্তুটিই এক সময় সূর্যে পরিণত হয়েছে। সেই মেঘের বাকী অংশগুলো থেকে ছোট ছোট বস্তু মিলে ধীরে ধীরে বিশাল আকার ধারণ করে। এদের কিছু কিছু গ্রহে পরিণত হয়। ধরে নেয়া হয় যে, ২৫ মিলিয়ন বছর ধরে এই প্রসেসটি চলে।

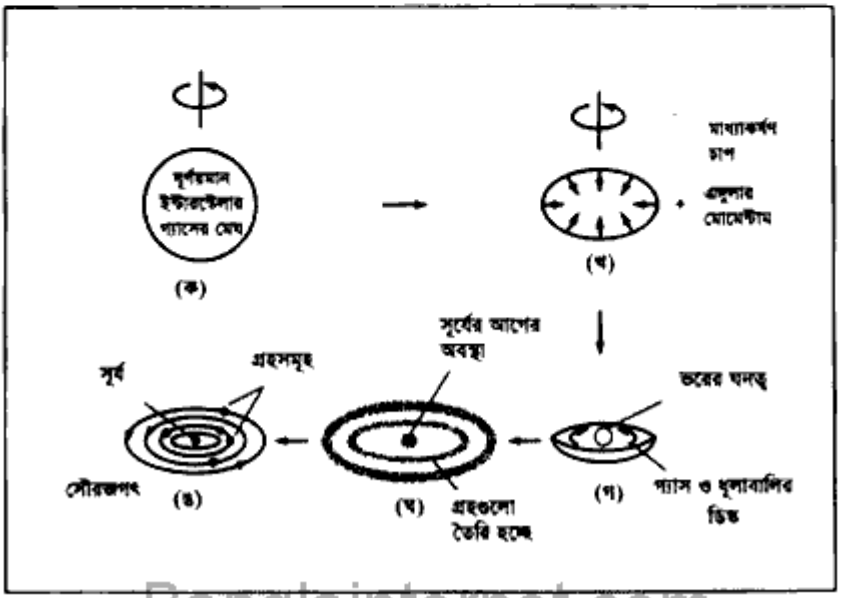

গ্যাসের মেঘ (ক) থেকে বর্তমান সৌরজগতের (ঙ) সৃষ্টির ধাপসমূহ

BanglaInternet.com

সূর্য থেকে অন্যান্য গ্রহগুলোর দূরত্ব কত?

সূর্যের ৯টি গ্রহ আছে। গ্রহগুলো ইলিপটিকাল অক্ষের উপর সূর্যের চারদিকে ঘুরে। ফলে কখনও কখনও গ্রহগুলো সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে, আবার কখনও দূরে সরে যায়। নিচে সূর্য থেকে অন্যান্য গ্রহের গড় দূরত্ব দেয়া হলো। প্রথমেই সূর্যের সবচে কাছের গ্রহ মার্কারি এবং তারপর দূরের গ্রহগুলো।

গ্রহ	গড় দূরত্ব কিলোমিটার	ব্যাসার্ধ - কিমি [পৃথিবীর সাপেক্ষে]	ভর [পৃথিবীর সাপেক্ষে]
মার্কারি	৫৭,০৯০,১০০	২,৪৩৯ [০.৩৮]	০.০৫
ভেনাস	১০৮,২০৮,৬০০	৬,০৫২ [০.৯৫]	০.৮৯
পৃথিবী	১৪৯,৫৯৮,০০০	৬,৩৭৮ [১.০০]	১.০০
মঙ্গল	২২৭,৯৩৯,২০০	৩,৩৯৭ [০.৫৩]	০.১১
বৃহস্পতি	৭৭৮,২৯৮,৪০০	৭১,৪৯২ [১১.০]	৩১৮.০০
শনি	১,৪২৭,০১০,০০০	৬০,২৬৮ [৯.০০]	৯৫.০০
ইউরেনাস	২,৮৬৯,৬০০,০০০	২৫,৫৫৯ [৪.০০]	১৭.০০
নেপচুন	৪,৪৯৬,৭০০,০০০	২৪,৭৬৪ [৪.০০]	১৭.০০
প্লুটো	৫,৯১৩,৪৯০,০০০	১,১৬০ [০.১৮]	০.০০২

সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে গ্রহগুলোর কত সময় লাগে?

নিচে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বিভিন্ন গ্রহের কী পরিমাণ সময় লাগে তা দেয়া হলো। এখানে সময়ের একক হিসেবে পৃথিবীর একটি দিন এবং একটি বৎসরকে ধরা হয়েছে।

গ্রহ	প্রদক্ষিণের সময়	
	পৃথিবীর দিন	পৃথিবীর বৎসর
মার্কারি	৮৮	০.২৪
ভেনাস	২২৪.৭	০.৬২
আর্থ/পৃথিবী	৩৬৫.২৬	১.০০
মার্স/মঙ্গল	৬৮৭	১.৮৮
জুপিটার/বৃহস্পতি	৪,৩৩২.৬	১১.৮৬
স্যাটার্ন/শনি	১০,৭৫৯.২	২৯.৪৬
ইউরেনাস	৩০,৬৮৫.৪	৮৪.০১
নেপচুন	৬০,১৮৯	১৬৪.৮
প্লুটো	৯০,৭৭৭.৬	২৪৮.৫৩

Banglainternet.com

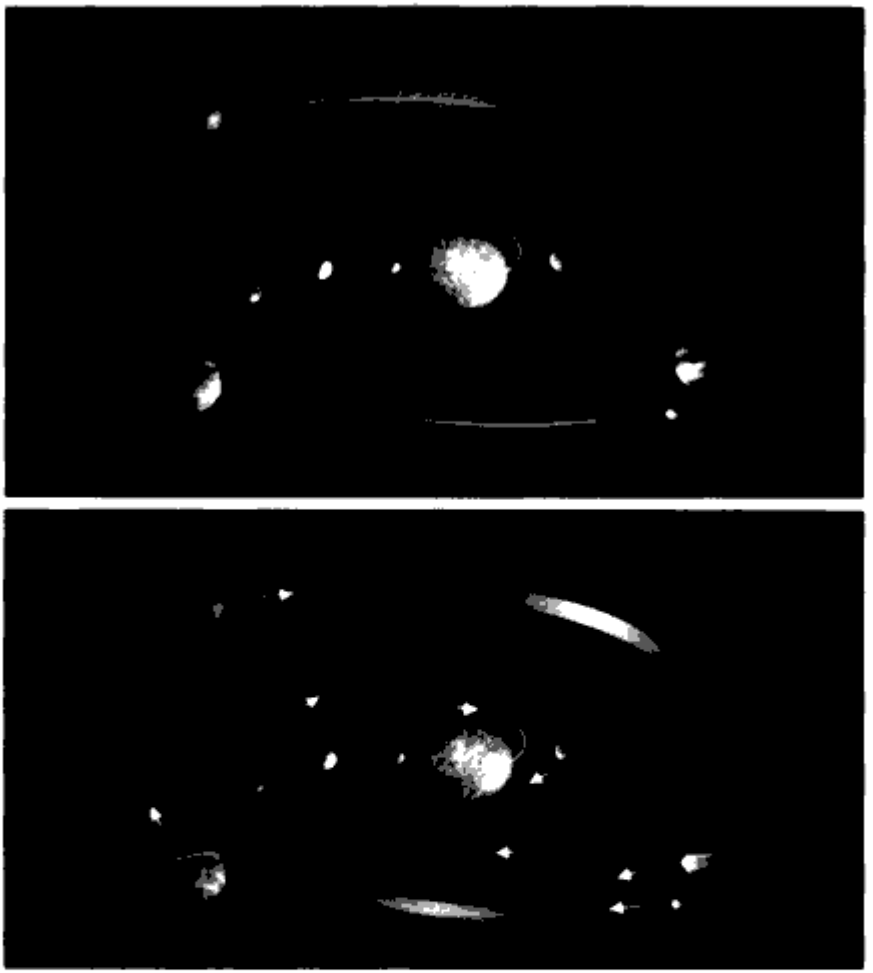

সূর্যকে ঘিরে অন্যান্য গ্রহগুলোর কক্ষপথ স্থির থাকার কথা নয়। হয়তো তারা ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের উপর এসে পরবে (উপরের চিত্র), নয়ত সূর্য থেকে দূরে সরে যাবে (নিচের চিত্র)

একটি দিন সব গ্রহে কি একই?

নাহ্, একটি দিন সব গ্রহে সমান নয়। একটি গ্রহ যখন নিজের কক্ষের চারদিকে একটি পূর্ণ ঘুরা সম্পন্ন করে, তখন সেখানে একটি দিন হয়। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে এই ঘুরার সময়টি ভিন্ন। সূর্যকে ঘিরে অন্যান্য গ্রহগুলো যেদিকে ঘুরে, ভেনাস, ইউরেনাস ও প্লুটো ঠিক তার উল্টো দিকে ঘুরে। পৃথিবীতে একটি দিন হয় ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে। কিন্তু ভেনাসে দিন হয় মাত্র ৩২ মিনিটে, মার্কারিতে ১৫ ঘন্টা ৩০ মিনিটে, মঙ্গলে ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিটে, জুপিটারে ৯ ঘন্টা ৫০ মিনিটে, শনিতে ১০ ঘন্টা ৩৯ মি, ইউরেনাসে ১৭ ঘন্টা ১৪ মি, নেপচুনে ১৬ ঘন্টা ৩ মিনিটে।

BanglaInternet.com

গ্রহগুলোর রঙ কী?

গ্রহ	রং
মার্কারি	কমলা
ভেনাস	হলুদ
আর্থ/পৃথিবী	নীল, বাদামি, সবুজ
মার্স/মঙ্গল	লাল
জুপিটার/বৃহস্পতি	হলুদ, লাল, বাদামি, সাদা
স্যাটার্ন/শনি	হলুদ
ইউরেনাস	সবুজ
নেপচুন	নীল
প্লুটো	হলুদ

ইনফেরিয়র এবং সুপেরিয়র গ্রহ কোনগুলো?

সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার জন্য সকল গ্রহের নিজের একটি কক্ষপথ রয়েছে। যে সকল গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের চেয়ে সূর্যের কাছাকাছি সেই গ্রহগুলোকে ইনফেরিয়র গ্রহ। সেই হিসাবে মার্কারি এবং ভেনাস হলো ইনফেরিয়র প্ল্যানেট বা নিচুজাতের গ্রহ। আর সুপেরিয়র প্ল্যানেট বা উঁচুজাতের গ্রহ হলো সেগুলো যাদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের চেয়ে বড়। মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো হলো সুপেরিয়র গ্রহ। তবে এই নামকরণের সাথে সেই গ্রহগুলোর গুণগত মানের কোনও সম্পর্ক নেই।

কোন গ্রহের রিং আছে?

জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস এবং নেপচুন সবারই রিং আছে। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে ভয়েজার-১ জুপিটারের রিংটি আবিষ্কার করে। গ্রহটির কেন্দ্র থেকে রিংটি ৮০,২৪০ মাইল (১২৯,১৩০ কিমি) পর্যন্ত বিস্তৃত। রিংটি ৪,৩০০ মাইল চওড়া এবং ২০ মাইলের একটু কম পুরু।

স্যাটার্নের রয়েছে সর্ববৃহৎ এবং চমৎকার রিং। এই গ্রহটি তার চারদিকে যে রিং দ্বারা আবিষ্ট তা ১৬৫৯ সালে আবিষ্কার করেন ডাচ এস্ট্রোনোমার ক্রিষ্টিয়ান হিউজেন (১৬২৯-১৬৯৫)। স্যাটার্নের রিংগুলোর ব্যাস ১৬৯,৮০০ মাইল (২৭৩,২০০ কিমি), কিন্তু পুরু মাত্র ১০ মাইলেরও কম। ওখানে ছয়টি বিভিন্ন রকমের রিং রয়েছে। এই রিংগুলোতে পানি রয়েছে, যা আকারে ক্ষুদ্র কণা থেকে কয়েক গজ ব্যাস হবে।

১৯৭৭ সালে যখন ইউরেনাস একটি তারাকে অতিক্রম করছিল তখন বিজ্ঞানীরা

BanglaInternet.com

খেয়াল করেন যে, গ্রহটি দ্বারা তারাটি পুরো ঢেকে যাওয়ার আগে তারাটি কয়েকবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একই ব্যাপার ঘটে যখন ইউরেনাস সেই তারাটিকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইউরেনাসের বিশাল আকারের রিং রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৯টি রিং আবিষ্কার করা হয়। ১৯৮৬ সালে ভয়েজার-২ আরো দুটি রিং খুঁজে পায়। এই রিংগুলো সরু, পাতলা এবং অন্ধকার।

১৯৮৯ সালে ভয়েজার-২ নেপচুনের চারপাশে অন্তত ৪টি রিং আবিষ্কার করে।

বিভিন্ন গ্রহের কতগুলো চাঁদ আছে?

নিচের টেবিলে বিভিন্ন গ্রহের চাঁদের সংখ্যা দেয়া হলো :

গ্রহের নাম	চাঁদের সংখ্যা	চাঁদের নাম
মার্কারি	০	
ভেনাস	০	
পৃথিবী	১	চাঁদ (মাঝে মাঝে একে লুনা বলা হয়।)
মার্স	২	ফোবস, ডিইমস
জুপিটার	১৬*	মেটিস, এড্রাসটি, এমালথিয়া, থিবি, আইয়ো, ইউরোপা, জেনিমেড, ক্যালিসটো, লেডা, হিমালিয়া, লাইসিথিয়া, ইলারা, এনানকি, কারমি, পেসিফিয়া, সিনোপি
স্যাটার্ন	১৮*	আটলাস, ১৯৮১এস১৩ (এখনও নাম দেয়া হয়নি) প্রমিথিউস, প্যানডোরা, ইপিমেথিউস, জেনাস, মাইমাস, এনসেলাডাস, টেথাইস, টেলেস্টো, ক্যালিপসো, ডাইয়োনি, হেলেন, রিয়া, টাইটান, হাইপারিয়ন, আইয়েপেটাস, ফিবি
ইউরেনাস	১৫	কর্ডেলিয়া, ওফেলিয়া, বিয়াংকা, ক্রেসিডা, ডেসডেমোনা, জুলিয়েট, পর্সিয়া, রোসালিন্ড, বেলিন্ডা, পাক, মিরান্ডা, এরিয়েল, আমব্রিয়েল, টাইটানিয়া, অবেরন
নেপচুন	৮	নাইয়াড, থালাসা, ডেসপিনা, গ্যালেটে, লারিসা, প্রটিয়াস, ট্রাইটন, নেরেইড
প্লুটো	১	চারণ

* আরো অনেক চাঁদের সন্ধান পাওয়া গেছে; তবে এখনও নিশ্চিত কিছু হয়নি

Banglainternet.com

প্রতিটি গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মান কত?

যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ১ ধরা হয়, তাহলে অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হলো -

সূর্য	২৭.৯
মার্কারি	০.৩৭
ভেনাস	০.৮৮
পৃথিবী	১.০০
চাঁদ	০.১৬
মার্স	০.৩৮
জুপিটার	২.৬৪
স্যাটার্ন	১.১৫
ইউরেনাস	০.৯৩
নেপচুন	১.২২
প্লুটো	০.০৬

এই টেবিলের মাধ্যমে ওজনের তুলনা করা যাবে। একজন মানুষ যদি পৃথিবীতে ১০০ পাউন্ড (৪৫.৩৬ কেজি) ওজন হয়, তাহলে সেই মানুষটির চাঁদে গিয়ে ওজন হবে ১০০x০.১৬ = ১৬ পাউন্ড (৭.২৬ কেজি)।

জভিয়ান এবং টেরেষ্ট্রিয়াল গ্রহ কোনগুলো?

জভিয়ান (জুপিটারের বিশেষণ) গ্রহ হলো জুপিটারের মতো গ্রহ। জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস এবং নেপচুন হলো জভিয়ান গ্রহ। এরা বিশাল আকারের গ্রহ, এবং প্রাথমিকভাবে হালকা উপাদান যেমন হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম দ্বারা তৈরী।

টেরেষ্ট্রিয়াল (পৃথিবীর ল্যাটিন শব্দ হলো টেরা) গ্রহ হলো পৃথিবী-সাদৃশ্য গ্রহ। এগুলো আকারে ছোট, এদের কঠিন তল আছে, এবং পাথর ও লোহা দিয়ে তৈরী। মার্কারি, ভেনাস, পৃথিবী এবং মার্স হলো টেরেষ্ট্রিয়াল গ্রহ। তবে প্লুটোকেও টেরেষ্ট্রিয়াল গ্রহ ধরা হয়, যদিও অন্যান্য গ্রহগুলো থেকে এর উৎপত্তি ভিন্ন।

গ্রহগুলোকে নক্ষত্র থেকে কিভাবে চেনা যায়?

সাধারণভাবে বললে, গ্রহগুলো থেকে স্থিরভাবে আলো আসতে থাকে; কিন্তু তারাগুলো ঝলমল করে অর্থাৎ আলো একবার আসে, আরেকবার নিভে যায়। পৃথিবী থেকে তারাগুলোর দূরত্ব এবং তারার আলোর উপর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতিসারাংক প্রভাব থাকায় এই ঝলমলে ভাবটি তৈরী হয়। পৃথিবী থেকে গ্রহগুলো তুলনামূলকভাবে তারাগুলোর চেয়ে অনেক কাছে।

Banglainternet.com

প্লানেট এক্স কী?

ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ দুটো আবিষ্কারের পর থেকে এস্ট্রোনোমাররা দেখতে পান যে, ওই দুটো গ্রহের কক্ষপথে কিছু গরমিল আছে। তারা মনে করেন, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ দুটো তৃতীয় আরেকটি গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৩০ সালে প্লুটোকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমে ভাবা হয়, ওই দুটো গ্রহের উপর প্লুটোর হয়তো প্রভাব আছে। কিন্তু প্লুটোর আকার এতো বড় নয় যে তা ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথের উপর প্রভাব ফেলবে। তারা মনে করেন, প্লুটোর কক্ষপথের বাইরে আরেকটি গ্রহ রয়েছে যা দ্বারা ওই দুটো গ্রহ প্রভাবিত হয়। সেই নতুন কাল্পনিক গ্রহটির নাম দেয়া হয়েছে 'প্ল্যানেট এক্স'। তাহলে সেই গ্রহটি হবে সৌরজগতের দশম গ্রহ। তবে এখন পর্যন্ত নতুন সেই দশ নম্বর গ্রহটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখনও খোঁজাখুজি চলছে।

সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম এসেছে কিভাবে?

পুরানো দিনের রাশিচক্রে মনে করা হতো যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা মহাশূন্যের সাতটি বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। এবং একেকটি বস্তু একেক দিনের প্রথম ঘন্টাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে মহাকাশের সেই বস্তুর নামে দিনটির নামকরণ করা হয়েছে। মেসোপটিমিয়াতে রাশিচক্রের প্রচলন ছিল এবং সেখানে 'সাত' সংখ্যাটি সবসময় শুভ মনে করা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ সালে মহারাজা কনস্টানটাইন এই রাশিচক্রকে রোমান ক্যালেন্ডারে স্থান দেন। নিচে সেই সাতটি মহাকাশের বস্তুর নাম ও তাদের নামানুসারে সপ্তাহের দিনের নামটি দেয়া হলো।

মহাশূন্যের বস্তু	দেবতার নাম	সপ্তাহের দিনের নাম
সান (সূর্য বা রবি)		সানডে (রবিবার)
মুন (চাঁদ)		মানডে (সোমবার)
মার্স (মঙ্গল)	টিউ	টুইসডে (মঙ্গলবার)
মার্কারি (বুধ)	উড্যান	ওয়েডনেসডে (বুধবার)
জুপিটার (বৃহস্পতি)	ডোনার	থ্রাসডে (বৃহস্পতিবার)
ভেনাস (শুক্র)	ফ্রিয়া	ফ্রাইডে (শুক্রবার)
স্যাটার্ন (শনি)		স্যাটারডে (শনিবার)

তবে দুটো মাসের নামও গ্রহদের নাম থেকে এসেছে। জানুয়ারি এসেছে জানুস (Janus) থেকে এবং মার্চ মাস এসেছে মার্স (Mars) থেকে।

Banglainternet.com

ভেনাস গ্রহটি কি রূপবতী?

ভেনাস শব্দের গ্রিক নাম হলো আফ্রোদিতি; আর ব্যাবিলনিয়ান নাম হলো ইষ্টার। এর অর্থ হলো প্রেম ভালোবাসা ও রূপের দেবী। মনে করা হয় যে, দেবী ভেনাসের শরীর হলো সবচে আদর্শ পরিমাপের এবং শারীরিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য সবচে সুন্দর। তার মিষ্টি চেহারায় সারাক্ষণ একটি হাসি লেগেই থাকতো। এই গ্রহটির নাম ভেনাস দেয়া হয়েছে সম্ভবত সেই পুরনো সময়ে এটাই ছিল সবচে' উজ্জ্বল গ্রহ। কয়েকটি অনিয়ম ছাড়া ভেনাস গ্রহের তলদেশের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের নামগুলোও এসেছে নারীর শরীরের বিভিন্ন নাম থেকে।

নারীর জীবন-প্রণালীকে বুঝানোর জন্য এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি হলো মূলত ভেনাস দেবীর হাতের আয়না - একটি বৃত্তের নিচে একটি ক্রস চিহ্ন। এই চিহ্নটি অনেক সময় মেয়েদের প্রজনন ব্যবস্থার সাথে যোগ করা হয়ে থাকে। ভেনাস ২৬৬ দিনে (পৃথিবীর দিনের সাপেক্ষে) একবার প্রদক্ষিণ করে। আবার একটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসতেও প্রায় একই পরিমাণ সময় লাগে। ভেনাসকে নিয়ে প্রচুর গল্প উপন্যাসও রয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ভেনাস পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত একটি গ্রহ। সূর্য ও চাঁদ ছাড়া এটাই হলো আকাশে সবচে উজ্জ্বল বস্তু। তবে এটাকে দুটো ভিন্ন বস্তু হিসেবে দেখা হতো। ইয়স্ফেরাসকে বলা হতো মর্নিং ষ্টার (সকালের তারা) আর হেস্পেরাসকে বলা হতো ইভিনিং ষ্টার (সন্ধ্যা তারা)। খালি চোখেই পৃথিবী থেকে ভেনাসকে দেখা যায়।

ভেনাস ইনফেরিয়র গ্রহদের একটি। সূর্যের দিক থেকে এটি দ্বিতীয় গ্রহ এবং আকারের দিক থেকে ষষ্ঠ বৃহত্তম। পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপের মাধ্যমে ভেনাসকে দেখলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। গ্যালিলিও এটা প্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে অবশ্য এটা কুপার্নিকাসের 'হেলিওসেন্ট্রিক' তত্ত্বের সাথে মিলে যায়।

১৯৬২ সালে প্রথম যে নভোযানটি ভেনাসকে দেখতে যায় তার নাম 'মেরিনার-২'। তারপর আরো ২০টির মতো নভোযান ভেনাসের উদ্দেশ্যে গিয়েছে। তার মধ্যে আমেরিকার 'পাইয়োনিয়ার ভেনাস' ও রাশিয়ার 'ভেনেরা-' হলো প্রথম দুটো নভোযান যেগুলো ভিন গ্রহে সর্বপ্রথম অবতরণ করে। এবং ভেনেরা-৯ নভোযানটি সর্বপ্রথম ভেনাসের পৃষ্ঠের ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়। অতি সম্প্রতি আমেরিকার নভোযান 'ম্যাগেলান' রাডারের মাধ্যমে ভেনাসের পৃষ্ঠদেশের বিশদ মানচিত্র তৈরী করতে সমর্থ হয়।

মাঝে মাঝে ভেনাসকে পৃথিবীর বোন হিসেবে বলা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ভেনাস পৃথিবী থেকে সামান্য ছোট (ব্যাস পৃথিবীর ৯৫%, ভর পৃথিবীর ৮০%)। উভয়ের কিছু ক্র্যাটার রয়েছে, যা থেকে বুঝা যায় তাদের পৃষ্ঠদেশের বয়স তুলনামূলকভাবে কম। এদের রাসায়নিক গঠনও একই

Banglainternet.com

রকম। এই ধরনের সাদৃশ্যের কারণে একসময় মনে করা হতো যে, ভেনাসের ঘন মেঘের নিচে পৃথিবীর মতো পরিবেশ থাকতে পারে, এবং সেখানে এমনকি জীবনও থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে আরো বিশদ গবেষণার পর দেখা গেছে যে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভেনাস পৃথিবী থেকে আলাদা। এবং এখানে জীবনের অস্তিত্ব সূর্যের গ্রহগুলোর মধ্যে সবচে কম।

পৃথিবীর সাগরের ১ কিলোমিটার নিচে যে পরিমাণ চাপ, ভেনাসের পৃষ্ঠদেশে ঠিক সেই পরিমাণ চাপ। ভেনাস মূলত কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে তৈরী। তবে ভেনাসের কয়েক কিলোমিটার পুরু সালফিউরিক এসিডের মেঘ রয়েছে। এই মেঘের কারণে ভেনাসের পৃষ্ঠদেশ বাইরে থেকে দেখা যায় না। এই ঘন মেঘ গ্রিন-হাউজ এফেক্ট তৈরী করেছে। ফলে সূর্যের আলো ভেনাসের পৃষ্ঠদেশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এবং তাপমাত্রা ৪০০ ডিগ্রি থেকে ৭৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়। এই তাপমাত্রা সীসা পর্যন্ত গলে যেতে পারে। সূর্য থেকে মার্কারির যা দূরত্ব, সূর্য থেকে ভেনাসের সেই দূরত্ব প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই গ্রিন-হাউজের কারণে ভেনাসে তাপমাত্রা মার্কারিরের চেয়েও বেশি।

ভেনাসের মাটি

মেঘের উপর বাতাসের গতিবেগ প্রায় ৩৫০কিমি/ ঘন্টা। কিন্তু পৃষ্ঠ-দেশে ঘন্টায় মাত্র কয়েক কিলোমিটার। সম্ভবত ভেনাসে একসময় পৃথিবীর মতো অনেক পানি ছিল: কিন্তু সব বাষ্প হয়ে উবে গেছে। বর্তমানের ভেনাস খুবই শুষ্ক। আমাদের এই পৃথিবী যদি আর একটু সূর্যের কাছাকাছি থাকতো, তাহলে পৃথিবীর ভাগ্যেও একই পরিণতি হতো। তবে ম্যাগেলানের রাডার থেকে দেখা যায় যে, ভেনাসে এখনও একটি বিশাল এলাকা জ্বলন্ত লাভা প্রবাহিত। বেশ কিছু বিশাল আকারের আগ্নেয়গিরিও রয়েছে। ভেনাসে কোনও ছোট আকারের ক্র্যাটার নেই। এর অর্থ হলো, ছোট আকারের সব মেটিওরয়েড ভেনাসের আবহাওয়া মণ্ডলেই পুড়ে যায়, পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

ভেনাসের কোনও চৌম্বক মেরু নেই। ভেনাস খুব মন্থর গতিতে ঘুরে। এই কারণে হয়তো কোনও মেরু তৈরী হয়নি। আবার ভেনাসের কোনও উপগ্রহ নেই।

Banglainternet.com

মার্স বা মঙ্গল গ্রহটি কি পুরুষ?

মার্স হলো সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ। রোমান যুদ্ধের দেবতা মার্সের নামানুসারে এই গ্রহের নাম রাখা হয়েছে মার্স। এই দেবতাকে গ্রিক পৌরাণিকে বলা হয় এরিস। আর ব্যাবিলনীয় জোতির্বিদ্যায় নাম হলো 'নারগাল'। পৃথিবী থেকে রাতের আকাশে মার্সকে লাল দেখায় বলে এর অপর একটি নাম হলো 'রেড প্ল্যানেট' বা লাল গ্রহ। মিশরীয়দের কাছে এই গ্রহটির পরিচয় হলো 'হরাস দি রেড'। হিব্রু ভাষায় একে বলা হয় মা'আদিম। মার্সের দুটো চাঁদ রয়েছে - ফোবস ও ডিমস। এগুলো আকারে ছোট এবং অসম আকৃতির। পৃথিবী থেকে খালি চোখে মার্সকে দেখা যায়। এর চিহ্নটি হলো একটি বৃত্তের উপরে উত্তর-পূর্ব দিকে তাক করা একটি তীর। প্রভু মার্সের প্রতিরক্ষাকে বুঝানোর জন্য ষ্টাইল করে এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এবং জীবের প্রতীক হিসেবে একটাকে পুরুষের চিহ্ন বলে ব্যবহার করা হয়।

মার্সে যে লাল রঙটি ফুটে উঠে সেটা আসে মার্সের পৃষ্ঠে আয়রন অক্সাইড বা লোহার জং থেকে। মার্সের ব্যাসার্ধ হলো পৃথিবীর অর্ধেক আর ভর হলো পৃথিবীর এক-দশমাংশ। তবে এর পৃষ্ঠদেশ হলো পৃথিবীর শুকনো জায়গার তুলনায় সামান্য কম। মার্সের আবহাওয়া মণ্ডল প্রায় ১১ কিলোমিটার পুরু, যেখানে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল ৬ কিলোমিটার পুরু। মার্সের আবহাওয়ায় রয়েছে ৯৫% কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ৩% নাইট্রোজেন, ১.৬% আর্গন। তাছাড়া অক্সিজেন ও পানির পরিমাণও রয়েছে। আবহাওয়ায় রয়েছে প্রচুর ধুলাবালি। তবে হালকা আবহাওয়া মণ্ডলের কারণে মার্সে তাপমাত্রা কম; সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অতি স্বল্প সময়ের জন্য মার্সের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। শীতকালে মেরুগুলো ক্রমাগত অন্ধকারে থাকে, এবং পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা এতই কমে যায় যে পুরো আবহাওয়া মণ্ডলের ২৫% জমে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের শুকনো বরফে পরিণত হয়ে যায়। আবার যখন মেরুগুলোতে সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসে তখন বরফ গলতে শুরু করে, আর প্রচণ্ড ঝড় উঠে (বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৪০০ কিলোমিটার)। এর ফলে আবহাওয়া মণ্ডলে প্রচুর ধুলা-বালি ঢুকে যায়।

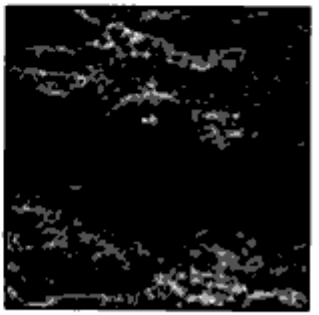

মাইক্রোস্কোপিক পাথর থেকে পানির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়

'মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার' নভোযান থেকে পরীক্ষা করে বলা হয় যে, মার্সের একটি অংশে চৌম্বক রয়েছে। ২০০৪ সালে যখন 'মার্স এক্সপ্লোরেশন রোভার্স' মার্সের পৃষ্ঠে অবতরণ করে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এক সময় মার্সে

Banglainternet.com

তরল পানির অস্তিত্ব ছিল। কারণ, কিছু কিছু খনিজ পদার্থ (যেমন হেমাটাইট ও জিওথাইট) পাওয়া গেছে যেগুলো পানি ছাড়া তৈরী হতে পারে না।

মঙ্গল গ্রহে রয়েছে এখন পর্যন্ত জানা সৌরজগতের সবচে উঁচু পাহাড় (২৬ কিলোমিটার) যার নাম 'অলিম্পাস মন্স' বা মাউন্ট অলিম্পাস। এখানে 'থারিস' নামের একটি উঁচু জায়গায় রয়েছে অনেকগুলো বিশাল আগ্নেয়গিরি। এই থারিসেই রয়েছে সৌরজগতের সবচে বড় ক্যানিয়ন 'মারিনার ভ্যালি', যা ৪০০০ কিলোমিটার লম্বা ও ৭ কিলোমিটার গভীর। মঙ্গল গ্রহে কোনও সমুদ্র নেই।

মঙ্গল গ্রহে কি জীবন আছে?

অনেক নমুনা দেখে অনুমান করা যায় যে, একটা সময় ছিল যখন মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি জীবনের জন্য অনুকূল ছিল। তবে সবচে বড় প্রশ্ন হলো, সত্যিকার অর্থেই ওখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি না?

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে নাসা 'ভাইকিং প্রোগ্রাম' নামে দুটো মানুষহীন নভোযান (ভাইকিং-১ এবং ভাইকিং-২) মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর কার্যক্রম নেয়। প্রতিটি ভাইকিং-এর ছিল দুটো অংশ - অরবিটার আর ল্যান্ডার। অরবিটার কক্ষপথে অবস্থান করে, আর ল্যান্ডার মাটিতে অবতরণ করে। অরবিটার এবং ল্যান্ডার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। অরবিটারের কক্ষপথ থেকে ছবি তোলার ক্ষমতা ছিল। এটাই ছিল এখন পর্যন্ত মার্সে পাঠানো সবচে ব্যয়বহুল এবং খুবই সফল মিশন। এর মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহের মাটি ও আবহাওয়ামণ্ডলের কম্পোজিশন নিয়ে গবেষণা করা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয় যে, মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে অনেক বিজ্ঞানী অস্বীকার করেন। ফলে পুরো বিষয়টি এখনও একটি ধাঁধা হিসেবেই রয়ে গেছে।

ভাইকিং-১ থেকে তোলা মঙ্গল গ্রহের ছবি

BanglaInternet.com

জুপিটার কি গ্রহদের রাজা?

পৌরাণিকে জুপিটার হলো দেবতাদের রাজা (কিং অফ গডস) যিনি অলিম্পাস শাসন করতেন এবং রোমান রাজ্যের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। জুপিটার ছিলেন আলো ও আকাশের দেবতা এবং প্রতিটি রাষ্ট্র ও আইনের রক্ষাকারী। তার গ্রিক নাম জিউস যার পিতা হলেন ক্রনাস (শনি বা স্যাটার্ন), আর নেপচুন ও জুনোর ভাই। তবে জুনো আবার তার স্ত্রীও বটে। তার ইংরেজী নাম হলো জবি (Jove).

জুপিটার হলো পৃথিবীর আকাশে চতুর্থ বৃহত্তর বস্তু। এর আগে রয়েছে সূর্য, চাঁদ ও ভেনাস। দূরত্বের দিক থেকে পঞ্চম আর আকারে সবচে বড় গ্রহ। প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকেই জুপিটার মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও যখন জুপিটারের দিকে টেলিস্কোপ তাক করেন, তখন তিনি চারটি উপগ্রহ দেখতে পান (আইও, ইউরোপা, জেনিমেড ও ক্যালিস্টো), যাদেরকে 'গ্যালিলিও চাঁদ' (গ্যালিলিয়ান মুন) বলা হয়ে থাকে।

১৯৭৩ সালে পাইওনিয়ার-১০ নভোযান সর্বপ্রথম জুপিটার গ্রহটিকে দেখতে যায়। পরবর্তীতে পাইওনিয়ার-১১, ভয়েজার-১, ভয়েজার-২ এবং ইউলিসিস একে দেখতে যায়। গ্যালিলিও নামের একটি নভোযান আট বছর ধরে জুপিটারকে প্রদক্ষিণ করে।

জুপিটার হলো একটি গ্যাস গ্রহ, যার কোনও কঠিন ত্বক নেই। জুপিটারে রয়েছে ৯০% হাইড্রোজেন আর ১০% হিলিয়াম। তবে এর সাথে মিথেন, পানি, এমোনিয়া এবং পাথরের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে। সম্ভবত জুপিটারে পাথরের কেন্দ্র আছে যা পৃথিবীর আকারের চেয়ে ১০-১৫ গুণ বেশি। তবে গ্যাস গ্রহগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বেশিরভাগই প্রত্যক্ষ নয়। এবং আরো অনেকটা সময় এভাবেই যাবে বলে মনে হচ্ছে।

সূর্য থেকে জুপিটার যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে, তার থেকে অনেক বেশি শক্তি সে বিকিরণ করে। জুপিটারের ভেতরটা খুবই উত্তপ্ত। আর জুপিটারের রয়েছে প্রচণ্ড চৌম্বকত্ব। আবার জুপিটারের রয়েছে শনি গ্রহের মতো রিং। কিন্তু সেটা খুবই হালকা এবং ক্ষুদ্র। এটাও আবিষ্কার হয়েছে হঠাৎ করেই। ভয়েজার-১-এর দু'জন বিজ্ঞানী জেদ করেন এই বলে যে, এক বিলিয়ন কিলোমিটার পথ চলার পর আরেকটু দেখে গেলেই হয় যে জুপিটারের কোনও রিং রয়েছে কি না! এতটা পথ আসার পর এটা পরীক্ষা করে যাওয়াটা অর্থবহ। সবাই ধরেই নিয়েছিল যে, কোনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেখানে রিং পাওয়া গিয়েছিল। এটা ছিল বিশাল এক পাওয়া। তখন ইনফ্রা-রেড রশ্মি দিয়ে ছবি তোলা হয়েছিল। তবে জুপিটারের রিংগুলো শনির মতো নয়; এগুলো অন্ধকার (আলবেডো প্রায় ০.০৫)। এবং এর ভেতর কোনও বরফ নেই।

জুপিটারের ৬৩টি উপগ্রহ রয়েছে। এদের অনেকগুলোর নাম পর্যন্ত ঠিক করা হয়নি। তবে জুপিটারের উপগ্রহগুলোর নাম রাখা হয়েছে জিউসের অসংখ্য প্রেমিকাদের নামানুসারে।

Banglainternet.com

শনি কি একটি অশুভ গ্রহ?

শনি গ্রহটি দেখতে সবচে সুন্দর

রোমান পৌরাণিকে স্যাটার্ন বা শনি হলো কৃষির দেবতা। একই দেবতা গ্রিকে রয়েছে ক্রনাস নামে, যিনি ইউরেনাস ও গেইয়ার সন্তান; আবার জিউসের (জুপিটার) পিতা। আর হ্যাঁ, আমাদের সপ্তাহের স্যাটারডে (শনিবার) দিনটির নাম এসেছে এই স্যাটার্ন থেকেই। হিন্দু রাশিফলে নয়টি গ্রহের (নবগ্রহ) কথা বলা হয়েছে যারা মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেখানে শনিকে একটি অশুভ গ্রহ হিসেবে দেখা হয়। শনির পিতা হলেন দেবতা সূর্য।

১৬১০ সালে গ্যালিলিও এই গ্রহটির বলয়কে দেখতে পান। ১৯৭৯ সালে নাসার পাইওনিয়ার-১১ নভোযানটি শনি গ্রহটিতে প্রথম বেড়াতে যায়। পরবর্তীতে ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ সেখানে পৌছে। ১ জুলাই ২০০৪ সালে নাসা ও ইএসএ (ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি) যৌথ কার্যক্রমে 'ক্যাসিনি' নভোযানটি শনির কাছে পৌছে। এটি চার বছর শনির কক্ষপথে থেকে প্রদক্ষিণ করবে।

শনি হলো সবচে হালকা (ঘনত্বের দিক থেকে) গ্রহ। এর মাধ্যাকর্ষণ হলো ০.৭ যা পানির চেয়েও কম। জুপিটারের মতো স্যাটার্ন হলো ৭৫% হাইড্রোজেন আর ২৫% হিলিয়াম। এখানে পানি, মিথেন, এমোনিয়া ও পাথরের সন্ধান মেলে।

শনি গ্রহের চারদিকে রয়েছে পরিষ্কার রিং বা বলয়। এই বলয়ে মূলত রয়েছে বরফ আর অল্প পরিমাণ ধূলিকণা। ইকুয়েটরের কাছে এই বলয় আরো বেশি চওড়া। পৃথিবী থেকে শনির তিনটি বলয় দেখা যায়। 'এ' ও 'বি' বলয় দুটো খুবই পরিষ্কার; কিন্তু বলয় 'সি' অনেকটা হালকা। বলয় এ ও বি-এর মাঝের জায়গাকে বলে ক্যাসিনি ডিভিশন। ভয়েজার আরো চারটি হালকা ধরনের বলয়ের ছবি তুলতে পেরেছে। তবে শনির বলয়গুলো অন্যান্য গ্রহের বলয়ের মতো অন্ধকার নয়, বেশ উজ্জ্বল (আলবেডো ০.২ থেকে ০.৬)। শনির বলয়গুলো খুবই ঘনত্বে হালকা, যদিও এদের ব্যাস ২৫০,০০০ কিলোমিটার বা আরো বেশি এবং চওড়া এক কিলোমিটারের চেয়ে কিছু কম। এরা দেখতে খুবই সুন্দর হলেও, এই বলয়ে পদার্থ বলে তেমন কিছু নেই। সবগুলো বলয়কে একত্রে করে ফেললে চওড়া ১০০ কিলোমিটারের বেশি হবে না।

রাতের আকাশে শনিকে খুব সহজেই দেখা যায়। যদিও এটি জুপিটারের মতো এতো উজ্জ্বল নয়, তবুও এটাকে চেনা যায়, কারণ শনি গ্রহটি নক্ষত্রের মতো জ্বলে আর নিভে না। ছোট ধরনের টেলিস্কোপ দিয়েই শনির বলয় ও বড় বড় উপগ্রহগুলো দেখা যায়। এর ৩৪টি উপগ্রহ রয়েছে।

Banglainternet.com

সবচে দূরের গ্রহ কোনটি?

এতোদিন প্লুটো ছিল সৌরজগতের সবচে' দূরের গ্রহ। কিন্তু প্লুটোকে গ্রহ থেকে বাদ দেয়ার পর নেপচুন হয়ে গেছে সবচে' দূরের গ্রহ। ব্যাসার্ধের দিক দিয়ে এটা হলো চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ; আর ভরের দিক দিয়ে তৃতীয় বৃহত্তম। নেপচুন পৃথিবী থেকে ১৭ গুণ ভারী। রোমান পৌরাণিকে সাগরের নাম থেকে রাখা হয়েছে এই গ্রহের নাম।

নেপচুনের আবহাওয়া মণ্ডলে রয়েছে প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। এবং সামান্য মিথেনের পরিমাণও পাওয়া গেছে। ফলে গ্রহটি দেখতে নীল রঙের। তবে ইউরেনাসেও একই পরিমাণ মিথেন রয়েছে। কিন্তু নেপচুন বেশি মাত্রায় নীল। তাই ধারণা করা হচ্ছে, নেপচুনে আরো কোনও গ্যাস রয়েছে যার কারণে এটা এতো বেশি মাত্রায় নীল। নেপচুনেই সবচে' জোরে বাতাস প্রবাহিত হয় - প্রায় ২৫০০কিমি/ঘন্টা। সূর্য থেকে এর দূরত্ব অনেক বেশি বলে এর বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি তাপমাত্রা হলো প্রায় -২১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে এর কেন্দ্রে তাপমাত্রা হলো ৭০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যা সূর্যের থেকেও বেশি।

১৮৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর নেপচুনকে আবিষ্কার করা হয়। তবে এটা প্রথাগত টেলিস্কোপের মাধ্যমে হয়নি; হয়েছিল গাণিতিক প্রেডিকশনের মাধ্যমে। অংক দিয়ে বের করা হয়েছিল যে, এখানে একটি গ্রহ থাকতে পারে। গ্যালিলিও-এর এস্ট্রোনামিকাল চিত্রগুলো থেকে তিনি দাবী করেন যে, ১৬১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর তিনি প্রথম নেপচুনকে দেখতে পান। এবং পরের বছর ১৬১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি আবার দেখতে পান। কিন্তু তিনি আসলে নেপচুনকে দেখেননি। তিনি একটি স্থির নক্ষত্রকে দেখেছিলেন। তাছাড়া গ্যালিলিওর ক্ষুদ্র টেলিস্কোপ দিয়ে সেটা পরিলক্ষিত হওয়ার কথা নয়।

একটি মাত্র নভোযান ভয়েজার-২ এই গ্রহটিকে ১৯৮৯ সালের ২৫ আগষ্ট ভ্রমণ করে। এবং তখন একটি বিশাল কালো স্পট আবিষ্কার করে। কিন্তু পরবর্তীতে হাবল স্পেস টেলিস্কোপে সেটা আর পরিলক্ষিত হয়নি। নেপচুনের ১৩টি চাঁদ রয়েছে; সবচে' বড় চাঁদটির নাম **ট্রাইটন**। খালি চোখে পৃথিবী থেকে নেপচুনকে দেখা যায় না।

পৃথিবীর ঘুরার গতি কি পরিবর্তন হয়?

এটা ঠিক যে, পৃথিবীর ঘুরার গতি বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়। জুলাইয়ের শেষপ্রান্তে এবং আগষ্টের শুরুর দিকে পৃথিবীর গতি সবচে বেশি থাকে। আবার এপ্রিল মাসে সবচে কম। এবং এর পার্থক্যটি হলো ০.০০১২ সেকেন্ড। প্রায় ১৯০০ সাল থেকে পৃথিবীর ঘুরার গতি বছরে ১.৭ সেকেন্ড কমে গিয়েছে। পৃথিবীর জন্মের প্রথম দিকে এর ঘুরার গতি খুব বেশি ছিল। ফলে দিনগুলো ছোট ছিল এবং বছরে অনেক বেশি দিন ছিল। একটি হিসাব দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে, এক বছরে দিনের সংখ্যা ছিল ৪০০ থেকে ৪১০ টি। আবার ২৮০ মিলিয়ন বছর আগে ৩৯০ দিনে একটি বছর হতো।

BanglaInternet.com

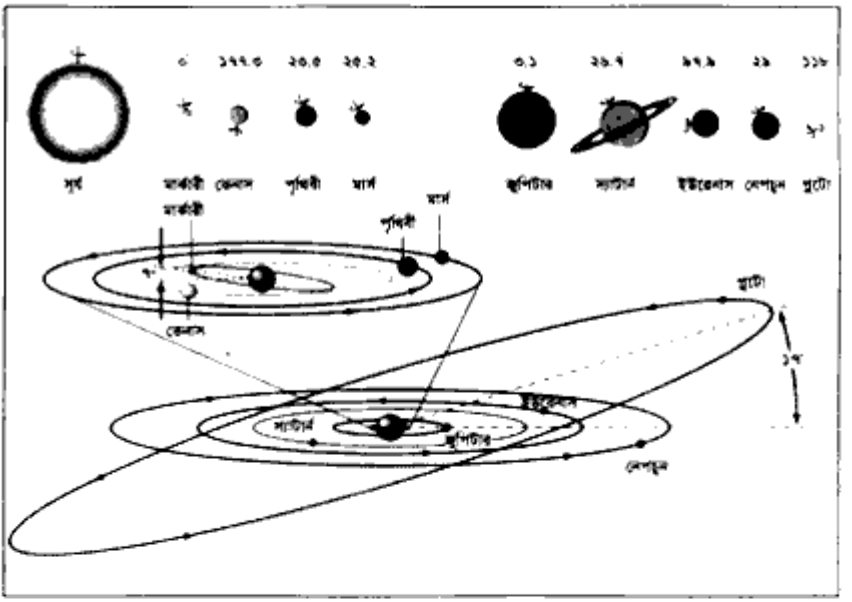

পৃথিবীর ঘুরার গতি

প্লুটোর জন্ম

প্লুটো ছিল সৌরজগতের সবচে দূরের গ্রহ। এবং ক্ষুদ্রতমও বটে। কিন্তু বর্তমানে সবচে' দূরের গ্রহ হলো নেপচুন। প্লুটো এমনকি সৌরজগতের সাতটি উপগ্রহের চেয়েও ছোট (চাঁদ, আইও, ইউরোপা, জেনিমেড, ক্যালিস্টো, টাইটান ও ট্রাইটন)। রোমান পৌরাণিকে প্লুটো (গ্রিক হ্যাডাস) হলো অদৃশ্য শক্তির দেবতা। প্লুটো নাম নিয়ে বেশ ঝামেলা হয়েছিল। অনেকগুলো নাম চলে এসেছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা থেকে শুরু বিভিন্ন মহল বিভিন্ন নাম সাজেশন হিসেবে পাঠাতে থাকে। যারা প্লুটোকে আবিষ্কার করেছিলেন তারাও তিনটি নাম দিয়েছিলেন - ক্রনাস, মিনার্ভা ও প্লুটো। কয়েক মাস পর এটাকে প্লুটো হিসেবেই ঘোষণা দেয়া হয়। তবে এই নামটি প্রথমে প্রস্তাব করেছিল ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে স্কুলে পড়া ১১ বছরের একটি মেয়ে ভেনেশিয়া বার্নে।

১৯৩০ সালে একটি সৌভাগ্যের দুর্ঘটনার মাধ্যমে প্লুটোর আবিষ্কার হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এরিজোনা রাজ্যের লয়েল (Lowell) পরিদর্শন কেন্দ্রে হিসাবে ভুল করে ক্লাইড টমবাগ এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করে ফেলেন।

প্লুটো হলো একমাত্র গ্রহ যেখানে নভোযান পৌছেনি। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে 'নিউ হরাইজন' নামের একটি নভোযান ছাড়া হয়েছে। যদি সবকিছু ঠিক ঠাক থাকে তাহলে ২০১৫ সালে এটি প্লুটোতে গিয়ে পৌছবে।

তবে প্লুটোরও একটি উপগ্রহ রয়েছে যার নাম 'চারণ'। ২০০৫ সালে আরো দুটো ক্ষুদ্র উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এদের নাম দেয়া হয়নি।

BanglaInternet.com

প্লুটো আর সূর্যের গ্রহ নয়

অনেক বছরের বিতর্কের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ২০০৬ সালের ২৪শে আগষ্ট ভোটের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত হয় যে, প্লুটোকে আর সূর্যের গ্রহ হিসেবে ধরা হবে না। প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা থেকে বাদ দেয়া হয়। এবং ফলে সৌরজগতে মোট গ্রহের সংখ্যা নয় থেকে কমে হয়ে গেল আট। তবে বিষয়টি খুবই বিতর্কিত। প্রাগে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এস্ট্রোনমিকাল ইউনিয়নের (আই.এ.ইউ) সভার শেষদিনে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪২৪ জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাদের ভোটে প্লুটোকে বাদ দেয়া হয় গ্রহের তালিকা থেকে। তাই এটা আরো বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কারণ পুরো পৃথিবীর শতকরা ৫ ভাগেরও কম জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই ভোটে অংশ নিয়েছে।

এর ফলে সৌরমণ্ডলে তিন ধরনের বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

১. গ্রহ - মার্কারি থেকে নেপচুন পর্যন্ত আটটি গ্রহ

২. ড্যুয়ার্ফ প্লানেট (বামুন গ্রহ) - প্লুটোসহ আরো অনেক গোলাকার বস্তু যেগুলো তার কক্ষপথের চারপাশের বস্তুগুলোকে পরিষ্কার করে নিজের কক্ষপথকে সুনির্দিষ্ট করতে পারেনি; এবং তারা আবার উপগ্রহও নয়।

৩. ক্ষুদ্র বস্তুকণা - অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র বস্তুকণা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

সমস্যাটা তৈরী হয়েছিল ১৯৩০ সালে যখন ক্লাইড টমবাগ প্লুটোকে আবিষ্কার করেছিলেন। তখন এটাকে নবম গ্রহ হিসেবে ধরা হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নেপচুনের পরে আরো কিছু গোলাকার বস্তুর অবস্থান আবিষ্কার করেন যারা প্লুটোর মতোই আকারে বড়। যেমন '২০০৩ ইউবি ৩১৩' ঠিক প্লুটোর আকারের সমান। এমনকি প্লুটোর যে চাঁদ 'চারণ' তার আকারও এতো বড় যে, পূর্বের সংজ্ঞানুযায়ী চারণও একটি গ্রহ হয়ে যায়। ফলে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই বলে আসছেন যে, প্লুটোকে গ্রহ বলাটা ভুল হয়েছে। এবং অনেকেই নতুন ধরণের আরেকটি শ্রেণী তৈরী করার পরামর্শ দেন, যেমন মাইনর প্লানেট বা ড্যুয়ার্ফ প্লানেট। তবে অনেকেই মনে করতেন, ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক কারণে প্লুটোকে গ্রহ হিসেবেই রাখা উচিত। কিন্তু এটা করতে গেলে আরো কিছু ছোট ছোট গোলাকার বস্তুও নিজেদেরকে গ্রহ বলে দাবী করার অধিকার রাখে। এবং পণ্ডিতেরা মনে করছেন, সৌরমণ্ডলের সীমানায় প্লুটোর মতো এমন শতাধিক বস্তু পাওয়া যাবে। তাই প্লুটো হয়ে গেল ড্যুয়ার্ফ গ্রহ।

কেউ কেউ মনে করছেন, নতুন সংজ্ঞাতেও ভুল রয়েছে। যেমন সেখানে বলা হয়েছে যে, গ্রহগুলো তাদের কক্ষপথে কোনও প্রতিবেশী বস্তু রাখতে পারবে না। কিন্তু পৃথিবী, মার্স, জুপিটার এবং নেপচুনের কক্ষপথে অনেক এষ্টোরয়েড প্রতিবেশী হিসেবে রয়েছে। জুপিটারের তো ৫০,০০০ বেশি ট্রজান এস্টোরয়েড রয়েছে। তারচেয়েও বড় কথা, যেখানে সারা বিশ্বে ১০,০০০ বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানী রয়েছে, সেখানে মাত্র ৪২৪ জনের ভোটে এটা ঠিক করা হবে কেন? তাই অনেকেই সেই সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আবার কাজ শুরু করেছেন।

Banglainternet.com

সৌরজগতের গ্রহগুলোর তুলনামূলক আকার

বাঁদিক থেকে - সূর্য, মার্কারি, ভেনাস, আর্থ (পৃথিবী), মার্স (মঙ্গল), জুপিটার (বৃহস্পতি), স্যাটার্ন (শনি), ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। সর্ববামে রয়েছে সূর্য। সূর্যের তুলনায় জুপিটার ও স্যাটার্ন খুবই ছোট। তার তুলনায় পৃথিবী আরো অনেক ক্ষুদ্র। এদের ব্যাসের পরিমাণগুলো খেয়াল করলে আরো সঠিকভাবে এদের আয়তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। মার্কারি ৪,৮৭৮ কিমি, ভেনাস ১২,১০৪ কিমি (মার্কারির প্রায় তিনগুণ), পৃথিবী ১২,৭৫৬ কিমি (ভেনাসের প্রায় সমান), মঙ্গল ৬,৭৯৪ কিমি (পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক), জুপিটার ১৪২,৯৮৪ কিমি (পৃথিবীর প্রায় ১১ গুণ), শনি ১২০,৫৩৬ কিমি (পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ), ইউরেনাস ৫১,১১৮ কিমি (পৃথিবীর ৪ গুণ), নেপচুন ৫০,৫৩০ কিমি (ইউরেনাসের প্রায় সমান) এবং প্লুটো ২,২৯০ কিমি (পৃথিবীর সাড়ে পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্লুটোকে গ্রহের মর্যাদা থেকে বাদ দিয়েছেন। এর আগে প্লুটোই ছিল সবচে' ছোট গ্রহ। কিন্তু এখন আকারে মার্কারি সবচে' ছোট গ্রহ।

Banglainternet.com

কমেট, মেটিওরাইট এবং অন্যান্য

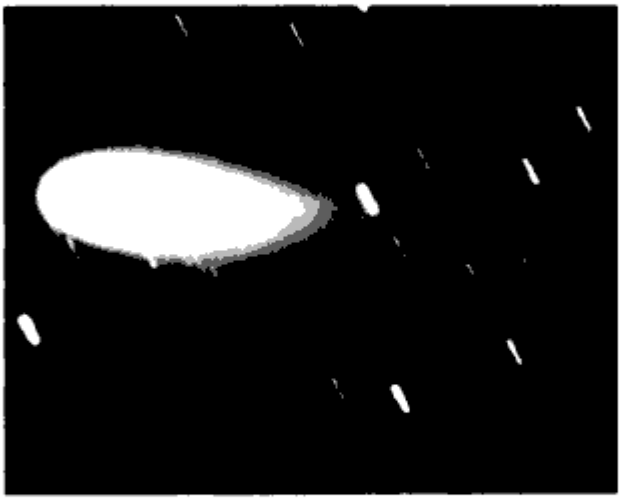

Banglainternet.com

কমেট, মেটিওরাইট এবং অন্যান্য

কমেট শব্দের বাংলা করা হয়েছে ধুমকেতু। কিন্তু ইংরেজী কমেট (comet) শব্দের অর্থ হলো 'লম্বা চুল বিশিষ্ট নক্ষত্র'। অনেকেই কমেটকে মেটিওরের সাথে মিলিয়ে ফেলে। হঠাৎ করে আকাশে যে নক্ষত্রের মতো আলো জ্বলে উঠে, সেটা কিন্তু কমেট নয়, ওগুলো মেটিওর। কমেট আকাশে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের বেশি সময় ধরে রাতের পর রাত জ্বলতে থাকতে পারে এবং নক্ষত্রের সাথে ধীর গতিতে সরে যেতে থাকে।

আমাদের সৌরজগতের সূর্যকে ঘিরে আটটি গ্রহ রয়েছে। তবে সূর্যের একার যে আকার ও ভর, তাতে সে সৌরজগতের একাই একশ। গ্রহরা তার কাছে খুবই তুচ্ছ। এই গ্রহরা ছাড়াও আরো হাজার হাজার ছোট ছোট পাথর রয়েছে যেগুলো সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এখানে ছোট অর্থ হলো একটি পুরো বাড়ির সমান থেকে শুরু করে বাংলাদেশের চেয়েও বড় হতে পারে। এগুলো হলো এস্টেরয়েড বা 'মাইনর প্লানেট'।

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করার মতো যে, সূর্যকে ঘিরে গ্রহ ও এস্টেরয়েডগুলো প্রায় একই সমতলে প্রদক্ষিণ করে। এর কারণ হলো একটা সময়ে এই সূর্য ও অন্যান্য বস্তুগুলো গরম গ্যাসের ডিস্ক আকারে ঘূর্ণায়মান ছিল। এটা অনেকটা খেলার লোহার চাকতির মতো। পার্থক্য শুধু, এটা গ্যাসের তৈরী। সেই গ্যাসের চাকতি থেকে তৈরী হলো গ্রহ ও এস্টেরয়েড। তারপর যেগুলো রয়ে গেছে পাথরের মতো, সেগুলো হলো কমেট।

কমেট বা ধুমকেতু হলো মূলত বিভিন্ন ধরনের গ্যাস ও ধুলার বিশাল আকৃতির মেঘ, মূলত বরফ আর তার সাথে কিছু ধুলা মিশ্রিত থাকে। বরফ দিয়ে একটি বল বানিয়ে সেটাকে মাটিতে ফেলে দিলে যেমন ধুলাবালি লেগে যাবে, সেটা অনেকটা এই কমেটের মতো হবে। ধুমকেতুরা প্লুটোর কক্ষপথেরও অনেক বাইরে চলাফেরা করে। দূরত্ব হিসাব করলে ১০০,০০০ এস্ট্রোনমিকাল ইউনিটের চেয়ে বেশি। মাঝে মাঝে তারাগুলো চলার পথে ধুমকেতুর কাছাকাছি চলে আসে। তখন ধুমকেতুরও চলার পথে

BanglaInternet.com

প্রভাব পড়ে। ফলে কখনও কখনও কোনও ধুমকেতু সূর্যের দিকে চলতে শুরু করে। তখন ধুমকেতু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সেটা গলে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়।

বাষ্পের মেঘকে এই কাজটি করেই সূর্য থেমে থাকে না। সূর্যের রয়েছে বায়ু প্রবাহ যার নাম হলো 'সোলার উইন্ড' যা মূলত চার্জযুক্ত কণা। এই কণাগুলো সূর্য থেকে চারদিকে সমান গতিতে ছুটতে থাকে। ফলে এই চার্জযুক্ত কণাগুলো মেঘের বাষ্প থেকে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে চলার পথে একটা লেজের সৃষ্টি হয়। মূলত সোলার উইন্ড এই লেজকে সূর্য থেকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। যেহেতু সোলার উইন্ড সূর্যের বিপরীতে বইতে থাকে, তাই কমেট যেদিকেই যাক না কেন, লেজটি সবসময় সূর্যের উল্টো দিকেই থাকে।

তবে এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। কমেটে যেহেতু ধুলাবালিও রয়েছে, তাই সোলার উইন্ড সেই ধুলাবালিকেও বয়ে নিয়ে যায়। তবে এই ধুলাবালি তুলনামূলকভাবে অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চেয়ে ধীর গতিতে সরে যায়। এই ধুলোকণাকে ফেলে রেখে কমেট নিজের মতো চলতে থাকে। ফলে এখানে আরেকটি লেজের সৃষ্টি হয়। তাই অনেক কমেটের দুটো লেজ দেখা যায়। প্রথমটিকে বলে আয়ণ টেইল (আয়ণ লেজ) আর দ্বিতীয়টিকে বলে ডাস্ট টেইল (ময়লার লেজ)।

ধুমকেতু - দুটো লেজ

এস্টেরয়েড কী?

সৌরজগতের আওতাধীন প্রধান যে আটটি গ্রহ আছে, তার বাইরে ছোট ছোট কিছু গ্রহ রয়েছে এদেরকে বলা হয় মাইনর প্ল্যানেট বা এস্টেরয়েড। এবং এগুলো কিন্তু মূল গ্রহগুলোর অংশ নয়। এস্টেরয়েড শব্দের অর্থ হলো 'তারার মতো'। এই ধরনের নামের পেছনে কারণ হলো, যখন টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা হয়, তখন ওগুলোতে আলোর উৎস আছে বলে মনে হয়।

বেশিরভাগ এস্টেরয়েডগুলো মার্স থেকে জুপিটারের মাঝে অবস্থিত, সূর্য থেকে ২.১ এবং ৩.৩ এস্ট্রোনমিকাল ইউনিটের ভেতর। ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারি সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ এস্টেরয়েডটি খুঁজে পাওয়া যায়, যার নাম দেয়া হয় সেরাস এবং ব্যাস হলো ৫৮২ মাইল। ১৮০২ সালে আবিষ্কার হয় দ্বিতীয় এস্টেরয়েড 'পাল্লাস'। তারপর থেকে এস্ট্রোনোমাররা ১৮,০০০ বেশি এস্টেরয়েড আবিষ্কার করেন এবং এদের মধ্যে ৫০০০ বেশি এস্টেরয়েডের কক্ষপথ নির্ধারণ করা হয়েছে।

এখানে বলা যেতে পারে যে, কিছু এস্টেরয়েডের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের

BanglaInternet.com

কাছাকাছি। ১৯৮৯ সালের ২২ মার্চ, এস্টেরয়েড '১৯৮৯ এফ.সি' (অন্য কোনও নাম এখনও দেয়া হয়নি) পৃথিবীর ৪৩৪,০০০ মাইলের ভেতর চলে এসেছিল। যদি ওই এস্টেরয়েডটি পৃথিবীকে আঘাত করতো তাহলে সেটা যে শক্তি ছড়াতো সেটা এক মিলিয়ন টন টিএনটি বোমা বিস্ফোরণের সমতুল্য। এবং এটা ৪.৩ মাইল চওড়া একটি ক্র্যাটার তৈরী করতো।

টুনগুসকা ইভেন্ট কী?

১৯০৮ সালের ৩০ জুন, মধ্য সাইবেরিয়ার 'পডকামেনায়া টুনগুসকা' নদীর উপর বায়ুমণ্ডলে একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছিল। একটি গহীণ বনে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে মাইলের পর মাইল যেমন পুড়ে যেতো, এটারও ক্ষমতা ছিল তেমনি। এই বিস্ফোরণের তীব্রতা ৬০০ মাইল দূর থেকেও অনুভূত হয়। এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের জন্ম হয়েছে।

কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর ওই এলাকায় মহাবিশ্ব থেকে কিছু একটা এসে আঘাত করেছিল। যদি তাই হবে, তাহলে ওই জায়গায় বিশাল একটি গর্ত হওয়ার কথা। কিন্তু ঘটনাটির জায়গায় তেমন কিছুর লক্ষণ দেখা যায়নি। আরো দুটি তত্ত্ব হলো- একটি ছোট আকারের ব্ল্যাক-হোল পৃথিবীকে আঘাত করেছিল, নয়তো ভিন গ্রহের কোনও স্পেসশিপ ওখানে দূর্ঘটনায় পড়েছিল। তবে ওখানে যদি ছোট আকারের ব্ল্যাক-হোল এসে থাকবে, তাহলে পৃথিবীর ঠিক উল্টো পিঠে তার কোনও প্রভাব থাকবে। তবে, তেমন কিছুর লক্ষণ পাওয়া যায়নি। আবার ওই জায়গার আশেপাশে স্পেসশিপের কোনও যন্ত্রাংশও পাওয়া যায়নি।

তবে সবচে গ্রহণযোগ্য কারণ হিসেবে দেখা হয়, কোনও একটি ধুমকেতু (কমেট) বায়ুমণ্ডলের কাছাকাছি চলে এসেছিল যা বিশাল আকারের আগুন ও তাপ ছড়িয়েছিল। ধুমকেতু যেহেতু মূলত বরফ দিয়ে তৈরী, তাই বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে সেটা গলে পানি হয়ে যেতে পারে।

হ্যালির কমেট কবে ফিরে আসবে?

প্রায় প্রতি ৭৬ বৎসরে একবার হ্যালির ধুমকেতু ফিরে আসে। বিগত শতকে শেষ বার একে দেখা যায় ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে। এবং মনে করা হচ্ছে আগামী ২০৬২ সালে একে আবার দেখা যাবে। তারপর ২১৩৪ সালে আরেকবার। তবে সোজা সাপ্টা ১৯৮৬ সালের সাথে ৭৬ বছর যোগ করলেই পরবর্তী সঠিক সময়টি পাওয়া যাবে না। কারণ বড় বড় গ্রহগুলোর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য কক্ষপথের সময়কাল পরিবর্তিত হয়। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে দেখা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৯ সাল থেকে পৃথিবী থেকে হ্যালির ধুমকেতু দেখা যেতো। এবং সেই খ্রিষ্টপূর্ব ২৩৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এই কক্ষপথের সময়কাল ৭৬ বছর (১৯৮৬ সাল) থেকে ৭৯.৩ বছর (৪৫১ ও

BanglaInternet.com

১০৬৬ সাল) পর্যন্ত পরিবর্তীত হয়েছে। যিশুর কালের সবচে' কাছাকাছি সময়ে এটি এসেছিল ১১ বি.সি এবং ৬৬ এ.ডি-তে। এদুটোর একটিও যিশুর জীবদ্দশায় ঘটেনি। তবে সবচে' বিখ্যাত প্রদর্শনীটি হয় ১০৬৬ সালে হ্যাস্টিংসের যুদ্ধের সময়।

ইংল্যান্ডের এস্ট্রোনোমার এডমন্ড হ্যালি (১৬৫৬-১৭৪২)-এর নামানুসারে এই ধুমকেতুর নাম রাখা হয়েছে। ১৬৮২ সালে তিনি লক্ষ্য করেন যে, একটি উজ্জ্বল ধুমকেতু পৃথিবীর দিকে আসছে যার কক্ষপথ ১৫৩১ ও ১৬০৭ সালে দেখা ধুমকেতুর সাথে মিলে যায়। তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই তিনটি ধুমকেতু আসলে একই ধুমকেতু এবং এর কক্ষপথের সময়কাল ৭৬ বৎসরের। ফলে প্রত্যেক ৭৬ বছরে একবার করে এই ধুমকেতু আবর্তিত হয়। ১৭০৫ সালে একটি গবেষণাপত্র বের করে যেখানে তিনি বলেন যে, এই ধুমকেতুটি আবার ১৭৫৮ সালে দেখা যাবে। ১৭৪২ সালে হ্যালি মারা যান। কিন্তু ১৭৫৮ সালে ক্রিসমাসের রাতে জার্মানির একজন কৃষক হ্যালির কথিত স্থানে সেই ধুমকেতুটিকে দেখতে পান। হ্যালির আগে ধুমকেতুকে স্বর্গীয় বিষয় বলে মনে করা হতো। তিনি প্রমাণ করেন যে, এগুলো হলো প্রাকৃতিক বিষয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের জন্য এমনটা হয়ে থাকে।

এডমন্ড হ্যালী

১৯৮৬ সালে ৫টি নভোযান হ্যালির ধুমকেতুকে দেখতে যায়। ইউরোপিয়ান এজেন্সির নভোযান 'গিয়োটো' হ্যালির ধুমকেতুর নিউক্লিয়াসের ছবি তুলতে সক্ষম হয়। এর নিউক্লিয়াসটি হলো ১৬x৮x৮ কিলোমিটার। তবে এটি খুবই কালো, যার পরিমাণ হলো মাত্র ০.০৩ আলবেডো। (আলবেডো হলো আলোর প্রতিফলন মাপার একক। সম্পূর্ণ কালো বস্তুর আলবেডো হলো ০.০, আর সাদা বস্তুর আলবেডো হলো ১.০।) নিউক্লিয়াসটি কয়লার চেয়েও কালো এবং সৌরজগতের মধ্যে অন্যতম কালো বস্তুদের মধ্যে একটি।

মেটিওরাইট এবং মেটিওরয়েডের মধ্যে পার্থক্য কী?

মেটিওরাইট হলো সেই সকল বস্তু যেগুলো পৃথিবীর বাইরে থেকে উৎপত্তি হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে কাটিয়ে পৃথিবীর মাটিকে আঘাত করে। মেটিওরাইটকে অনেক সময় মেটিওরয়েড বা মেটিওর-এর সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। মেটিওরয়েড হলো মহাশূন্যে ছোট ছোট বস্তু যাদের ব্যাস সাধারণত ৩০ ফুটের নিচে।

আর মেটিওরকে বলা হয় 'শুটিং স্টার' বা পড়ন্ত নক্ষত্র। যখন কোনও বস্তু মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে ঘর্ষণের জন্য আগুন ধরে সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, তাকে বলা হয় মেটিওর। মেটিওর কখনই পৃথিবীর মাটিতে পৌছাতে পারে না। দিন-রাতে লক্ষ লক্ষ বস্তুকণা বাতাসের সাথে ঘর্ষণের শিকার হচ্ছে। তবে এগুলোকে কেবলমাত্র দেখা যায় রাতের আকাশে। কোনও পরিষ্কার রাতের

Banglainternet.com

শুটিং স্টার, ফায়ার বল

আকাশে গড়ে প্রতি ঘণ্টায় কয়েকটি (প্রতি ১০ থেকে ১৫ মিনিটে একটি) মেটিওর দেখা যেতে পারে। তবে বছরের কিছু কিছু সময় মেটিওরের বৃষ্টি (মেটিওর শাওয়ার) হয়। তখন পৃথিবীর মানুষ সেই পড়ন্ত নক্ষত্র দেখার জন্য ভীড় করে। এই সময়ে ঘণ্টায় ১০০টির মতো মেটিওর দেখা যেতে পারে। খুব উজ্জ্বল মেটিওরকে বলা হয় 'ফায়ার বল'। তবে এগুলো আকার ক্ষুদ্র বালু কণা থেকে টেবিল টেনিস বলের সমান হতে পারে। স্বভাবতই বড়গুলো দেখতে খুব সুন্দর; কিন্তু সহসাই এগুলো দেখা যায় না।

উপরের ছবিটিতে একটি ফায়ার-বল মেটিওর দেখানো হয়েছে। এটি ফিস-আই ক্যামেরা দিয়ে ইউরোপিয়ান ফায়ার-বল নেটওয়ার্কের চেকোশ্লোভাকিয়াতে অবস্থিত স্টেশন থেকে ২১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে তোলা হয়েছে।

মেটিওরয়েড যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায় তখন সেগুলো মেটিওর-এ পরিণত হয়; আর মেটিওরয়েডের কোনও অংশ যদি কখনও পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছায়, তখন সেটা মেটিওরাইটে পরিণত হয়। নিচের চিত্র থেকে এটা আরো পরিষ্কার হতে পারে।

মেটিওরয়েড	---->	মেটিওর	---->	মেটিওরাইট
(মহাশূন্যে)		(পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে)		(পৃথিবীর মাটিতে)

Banglainternet.com

পৃথিবীতে কতগুলো মেটিওরাইট এসে পৌছে?

প্রতি বছর প্রায় ২৬,০০০ মেটিওরাইট পৃথিবীতে এসে পড়ে যাদের প্রতিটির ভর ৩.৫ আউন্সের উপরে। কানাডিয়ান ক্যামেরা নেটওয়ার্ক আকাশে যত আগুনের ফুলকি দেখতে পায়, সেই তথ্য থেকে এই সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। মজার বিষয় হলো, এই বিশাল সংখ্যক মেটিওরাইটের মধ্যে কেবলমাত্র ৫টি বা ৬টি মানুষ দেখতে পায়, কিংবা কারো সম্পত্তির ক্ষতি করে। বাকী সবগুলোই গিয়ে সাগরের পানিতে পতিত হয়, কারণ পৃথিবীর প্রায় ৭০% অংশ পানি দ্বারা আবৃত।

তবে আমরা কি চিন্তা করতে পারি, বড় ধরনের কোনও মেটিওর যদি সত্যি সত্যি পৃথিবীর মাটিতে আঘাত করে তাহলে কী ঘটতে পারে?

তবে প্রায় ৫০,০০০ বছর আগে একটি বিশাল আকারের মেটিওর আমেরিকার এরিজোনা রাষ্ট্রের উত্তর অংশে পতিত হয়েছিল, যা বিশাল আকারের একটি ক্রেটার তৈরী করে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'বারিঙ্গার মেটিওর ক্রেটার'। একশ' বছর আগে জনাব ডি. এম. বারিঙ্গার সর্বপ্রথম এই ক্রেটারটির এক প্রান্তে উঠেন। তার নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এটি আড়াআড়ি ১ কিলোমিটারের মতো চওড়া।

পৃথিবীতে প্রাপ্ত বৃহত্তম মেটিওরাইট কোনটি?

নিউইয়র্কে অবস্থিত আমেরিকান মিউজিয়াম অফ নেচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সবচে' বড় মেটিওরাইটটি রাখা আছে। এটা ১০ ফুট লম্বা (৩.০৪৮ মিটার) এবং ৫ ফুট উঁচু (১.৫২৪ মিটার)।

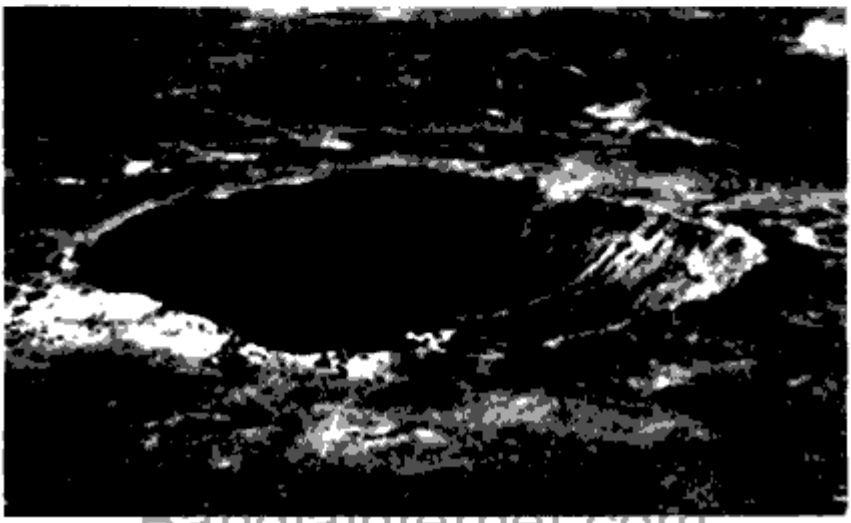

বারিঙ্গার মেটিওর ক্রেটার, এরিজোনা, যুক্তরাষ্ট্র

BanglaInternet.com

কত ধরনের মেটিওরাইট রয়েছে?

মূলত চার ধরনের মেটিওরাইট রয়েছে। এগুলো হলো আয়রন মেটিওরাইট, ক্রনড্রাইটস, অ্যাকনড্রাইটস ও ষ্টোনি আয়রন মেটিওরাইটস।

আয়রন মেটিওরাইট সৃষ্টি হয় সেই সকল এস্টেরয়েড থেকে যেগুলো মার্স ও জুপিটারের মাঝে অবস্থান করে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। আয়রন মেটিওরাইট চেনার দুটো উপায় আছে - স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশন এবং কেমিক্যাল ক্ল্যাসিফিকেশন। আয়রন নিকেল ধাতুর ক্রিষ্টালের আকার ও প্রকার দেখে স্ট্রাকচারাল শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। যারা নিয়মিত মেটিওরাইট সংগ্রহ করে থাকে, তাদের কাছে এটি খুব ভালো একটি পদ্ধতি। তবে বিজ্ঞানীরা নির্ভর করেন কেমিক্যাল শ্রেণীবিন্যাসের উপর। পৃথিবীতে যত মেটিওরাইট এসে পতিত হয়, তার শতকরা ৫.৭ ভাগ হলো এই আয়রন মেটিওরাইট।

তবে পৃথিবীতে সবচে' বেশি যে মেটিওরাইট পতিত হয় তার নাম হলো ক্রনড্রাইটস। শতকরা ৮৫.৭ ভাগ মেটিওরাইট হলো এই গোত্রের।

আর অ্যাকনড্রাইটস মেটিওরাইট পতিত হয় শতকরা ৭.১ ভাগ। চাঁদ, মার্স বা অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহের শরীর থেকে এগুলো পৃথিবীতে চলে আসে।

সবচে' সুন্দর ও দূর্লভ মেটিওরাইট হলো ষ্টোনি আয়রন মেটিওরাইট (শতকরা ১.৫ ভাগ পতিত হয়)। এর ভেতর থাকে প্রায় সমপরিমাণ আয়রন আর সিলিকেট। বেশিরভাগ ষ্টোনি আয়রন মেটিওরাইটকে প্যালাসাইট কিংবা মেসসাইডারাইট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই ধরনের পাথর পৃথিবীর গর্ভে প্রায় ২০০০ মাইল (৩৪৮০ কিমি) পাওয়া যাবে, যা মানুষের পক্ষে বের করে আনা সম্ভব নয়। তাই একমাত্র মহাশূন্য থেকেই এই পাথর মানুষ পেতে পারে। এবং এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত যাবতীয় সুন্দরতম পাথরের মধ্যে এটি একটি।

মেটিওরাইট চেনার উপায় কী?

ছয়টি গুণাবলী দিয়ে মেটিওরাইট চেনা যেতে পারে; সেগুলো হলো আয়রনের উপস্থিতি, ঘনত্ব, চৌম্বকত্ব, ক্রনড্রুলের উপস্থিতি, ফিউসন ক্রাষ্ট ও রেগমাগ্লিপ্টস।

প্রায় সকল মেটিওরাইটে কিছু পরিমাণ লোহা (আসলে লোহা ও নিকেল ধাতুর মিশ্রণ) থাকবেই। ভাঙ্গা অংশে লোহা ধাতু চকচক করতে থাকবে।

পৃথিবীতে যত পাথর পাওয়া যায়, মেটিওরাইটগুলো সাধারণত এদের চেয়ে বেশি ঘন এবং ভারী। লোহা ধাতুর ঘনত্ব হলো ৮ গ্রাম/সিসি। এবং যেসকল মেটিওরাইটে লোহা থাকে তাদের ঘনত্ব হলো ৩.৩ গ্রাম/সিসি।

বেশিরভাগ মেটিওরাইটে কিছু লোহা-নিকেল থাকে এবং চুম্বককে আকর্ষণ করে। ষ্টোনি মেটিওরাইটে সামান্য পরিমাণ ধাতু থাকে। কিন্তু সেটাও চুম্বককে টেনে নেবে।

সবচে' সাধারণ যে মেটিওরাইট পৃথিবীতে পতিত হয় সেটা হলো ক্রনড্রাইটস যা স্টোন মেটিওরাইট। এরা ক্ষুদ্র পাথরের বলের মতো (প্রায় এক মিলিমিটার) বস্তু ধারণ

Banglainternet.com

করে যাদেরকে বলে ক্রন্ড্রুলেস।

যখন মেটিওরাইট পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল অতিক্রম করে পৃথিবীতে পতিত হয়, তখন এদের বাইরের পৃষ্ঠদেশ গলে যায়। একটি হালকা আবরণ তৈরী হয়। একে বলে ফিউসন ক্রাষ্ট। এটা সাধারণত কালো রঙের হয়। তবে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পরপরই সংগ্রহ না করলে সেটা বাদামী হয়ে যেতে পারে।

আবার যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে, তখন অনেক সময় এদের পৃষ্ঠদেশে রেগমাগ্লিপ্টস তৈরী হয়। এগুলো দেখতে অনেকটা আঙ্গুলের ছাপের মতো।

আন্তর্জাতিক মেটিওর সংস্থা

১৯৮৮ সালে গঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল মেটিওর অর্গানাইজেশন (আই.এম.ও) এবং বর্তমানে ২৫০টির বেশি সদস্য রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে মেটিওর নিয়ে কাজ করার সমন্বয়ের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। পুরো পৃথিবী জুড়ে যেখানে মেটিওর পাওয়া যায়, সেগুলোর তথ্য নিয়ে কাজ করে এই সংস্থা। তবে এটি মূলত একটি অ-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

প্রচলিতভাবে মেটিওর দেখার জন্য তেমন কোনও প্রশিক্ষণের বা দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। আই.এম.ও বিভিন্ন সময়ে যেসকল নিয়ম-নীতি প্রকাশ করে থাকে সেগুলো খেয়াল করলেই যে কেউ কিছু দিনের মধ্যেই একজন পর্যবেক্ষককে পরিণত হতে পারে। প্রতি মাসে কয়েক ঘন্টা করে আকাশকে পর্যবেক্ষণ করলেই একটা সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছানো যেতে পারে।

সেই লক্ষ্যে আই.এম.ও প্রতি দুই মাসে একটি করে জার্নাল প্রকাশ করে। সেখানে মেটিওর সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যারা মেটিওর নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী, তাদের জন্য এটি একটি খুবই উপকারী জিনিস। কেউ যদি মেটিওর খুঁজে পায়, তাহলে আই.এম.ও তার সেই নমুনাটির সঠিক কিনা সেটা বুঝার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ যদি আনাড়ী পর্যবেক্ষক থাকে, এবং গভীরভাবে জোতির্বিদ্যাকে জানতে চায়, তাহলে আই.এম.ও-তে যোগ দেয়াটা ভালো হবে। ইন্টারনেটে এদের ওয়েব সাইটের ঠিকানা হলো — http://www.imo.net

Banglainternet.com

পৃথিবী
একটি গ্রহ

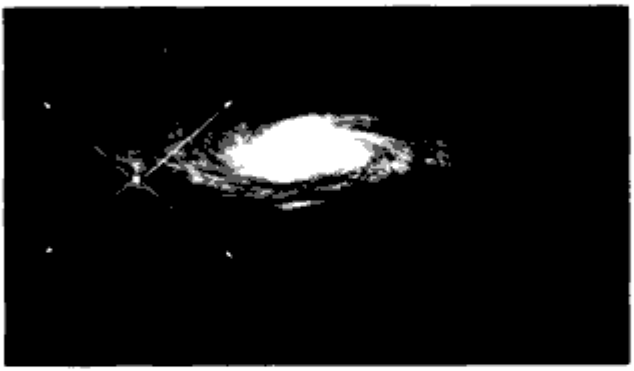

Banglainternet.com

পৃথিবী একটি গ্রহ

পৃথিবী (আর্থ) হলো সূর্যের দূরত্ব অনুসারে তৃতীয় এবং আকারের দিক থেকে পঞ্চম গ্রহ। এটি একমাত্র গ্রহ যার নাম গ্রিক বা রোমান পৌরাণিক থেকে নেয়া হয়নি। এর নাম নেয়া হয়েছে পুরনো ইংরেজী ও জার্মান শব্দ থেকে। তবে প্রতিটি ভাষাতেই পৃথিবীর নিজস্ব নাম রয়েছে। সেই হিসেবে এই গ্রহটির নাম কয়েকশত হবে। অবাক করার মতো হলেও সত্যি যে, এই ১৬শ শতাব্দীতে কুপার্নিকাসের আগে কেউ ধারণাই করতে পারেনি যে, পৃথিবী একটি গ্রহ। যদিও পৃথিবীকে ষ্টাডি করতে স্পেসক্রাফটের প্রয়োজন হয়না, তবুও বিংশ শতাব্দীর আগে এই গ্রহের পুরো মানচিত্র মানুষের কাছে ছিল না। মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর তোলা ছবিগুলো অস্বাভাবিক রকমের সুন্দর।

আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ স্থান পানি দিয়ে ঢাকা। পৃথিবী হলো একমাত্র গ্রহ যেখানে পানি তরল অবস্থায় পৃষ্ঠদেশে রয়েছে। আর জীবন ধারণের জন্য এই তরল পানির প্রয়োজন। পাশাপাশি সাগরের পানি পৃথিবীর তাপমাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কী দিয়ে তৈরী?

পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, শতকরা ২১ ভাগ অক্সিজেন এবং শতকরা ১ ভাগেরও কম আর্গন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তবে তাছাড়া হাইড্রোজেন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জিনন, মিথেন এবং ওজনের অস্তিত্বও আছে। পৃথিবীর প্রথম দিকের আবহাওয়া সম্ভবত তৈরী হয়েছিল এমোনিয়া ও মিথেন দিয়ে। ২০ মিলিয়ন বছর আগ থেকে বাতাসে বিভিন্ন ধরণের উপাদান ধারণ করতে শুরু করে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কতগুলো স্তর আছে?

পৃথিবীকে বিভিন্ন ধরণের গ্যাস আবৃত করে রেখেছে। তাপমাত্রা দিয়ে এই স্তরগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

Banglainternet.com

ট্রোপস্ফেয়ার : এটা হলো পৃথিবীর ভূ-মণ্ডলের সবচে কাছের বায়ুমণ্ডল। গড়ে এর উচ্চতা হলো ৭ মাইল (১১ কিলোমিটার)। বেশিরভাগ মেঘ এবং জলবায়ু এই স্তরেই বিদ্যমান। এই স্তরে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রাও কমতে থাকে।

স্ট্রাটোস্ফেয়ার : পৃথিবী ভূমির উপর ৭ মাইল থেকে ৩০ মাইলের মধ্যের স্তরটি হলো স্ট্রাটোস্ফেয়ার। এই স্তরেই ওজন স্তরটি রয়েছে। সূর্যের যাবতীয় অতিবেগুনী রশ্মি যেগুলো পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর সেগুলোকে ওজন স্তর আটকে রাখে। এই স্তরে উচ্চতা বাড়লে তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে। এবং সর্বোচ্চ ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে পারে।

মেসোস্ফেয়ার : এই স্তরটি স্ট্রাটোস্ফেয়ারের উপরের স্তর, পৃথিবীর উপর ৩০ থেকে ৫৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। উচ্চতা বাড়তে থাকলে তাপমাত্রা কমতে থাকে (-৯০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)।

থার্মোস্ফেয়ার : পৃথিবীর উপর ৫৫ থেকে ৪৩৫ মাইল (৮৫ থেকে ৭০০ কিলোমিটার) পর্যন্ত স্তরকে বলে থার্মোস্ফেয়ার। এর অপর নাম হেটোরিওস্ফেয়ার। এই স্তরের তাপমাত্রা ১৪৭৫° সেন্টিগ্রেড (১৬৯৬° ফারেনহাইট) পর্যন্ত হতে পারে।

এক্সোস্ফেয়ার : থার্মোস্ফেয়ারের উপরের যেকোনও স্থান হলো এক্সোস্ফেয়ার। এটা মূলত ৭০০ কিলোমিটার (৪৩৫ মাইল) উপর থেকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে তাপমাত্রা এতই বেশি যে আলাদা করে এর কোনও অর্থ নেই।

এপোলো-১১ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি- আফ্রিকা ইউরোপ ও এশিয়া দেখা যাচ্ছে

তবে এই পাঁচটি স্তরের বাইরে আরেকটি স্তর আছে যা অন্য স্তরগুলোর উপর মিলেমিশে গেছে; তার নাম আয়নোস্ফেয়ার। পৃথিবীর উপর ৪৮ থেকে ৪০২ কিলোমিটার (৩০ থেকে ২৫০ মাইল) পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। এই স্তরে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ফলে বাতাস আয়ণাইজড (বিদ্যুতায়ন) হয়ে যায়। এই স্তর রেডিও তরঙ্গের প্রবাহ ও প্রতিফলনকে প্রভাবিত করে। এই স্তরের

BanglaInternet.com

তিনটি এলাকা রয়েছে - 'ডি' এলাকা (৫৬ থেকে ৮৮ কিলোমিটার), 'ই' এলাকা (৫৬ থেকে ১৫৩ কিলোমিটার) এবং 'এফ' এলাকা (১৫৩ থেকে ৪০২ কিলোমিটার)।

আকাশ নীল কেন?

সূর্যের আলোর সাথে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার ফলে আকাশ নীল দেখায়। মহাশূন্য থেকে (আউটার স্পেস) আকাশকে নীল দেখা যায় না, তখন কালো দেখা যায়; কারণ ওখানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল নেই। সূর্যের আলোতে সাতটি রঙের আলো মিশ্রিত থাকে এবং এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। এই আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে স্পর্শ করে, তখন বিভিন্ন কণা এই আলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। সূর্যের সাদা আলোর ভেতর নীল রঙটির তরঙ্গ দৈর্ঘ সবচে' ছোট। ফলে এই রঙটি অন্যান্য রঙ থেকে সবচে' বেশি ছড়িয়ে পড়ে। এবং বাতাসের কণার ভেতর এই রঙটি ছড়িয়ে যায়। এই কারণে আকাশ নীল দেখায় এবং সূর্য হলুদ দেখায়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সাদা রঙ থেকে নীল রঙটি বের করে নিলে হলুদ রঙ ধারণ করে।

আবার সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময় আকাশের রঙ পরিবর্তিত হয়; কারণ তখন আলোকে অনেক বেশি পুরু বায়ুমণ্ডল পার হয়ে পৃথিবীতে আসতে হয়। তখন লাল ও কমলা রঙ দুটির তরঙ্গ দৈর্ঘ লম্বা বলে এরা বেশি পরিমাণ পৌছাতে পারে। ফলে আকাশ লালচে দেখায়।

পৃথিবীর ভর কত?

পৃথিবীর ভর হলো প্রায় ৫.৯৭ x ১০২৪ কিলোগ্রাম বা ৬ সেক্সটিলিয়ন।

পৃথিবীর পরিধি কত?

পৃথিবীকে যদিও গোলাকার ধরা হয়, তবে দুটি গোলার্ধে এটা বেশ চ্যাপ্টা আর ইকুয়েটর বরাবর একটু ফোলা। তাই ইকুয়েটর বরাবর পরিধি হলো ২৪,৯০২ মাইল (৪০,০৭৫ কিলোমিটার) এবং গোলার্ধ বরাবর পরিধি ২৪,৮৬০ মাইল (৪০,০০৮ মাইল)।

পৃথিবীর গর্ভে তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয় কিভাবে?

পৃথিবীর যত গভীরে যাওয়া যাবে, তাপমাত্রা ততই বাড়তে থাকবে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খনির ভেতর এবং গভীর গর্ত করে তাপমাত্রা মেপে দেখা গেছে যে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার স্থানভেদে ভিন্ন। এবং প্রতি কিলোমিটার গভীরে গেলে ১৫°

Banglainternet.com

থেকে ৭৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে প্রকৃত অর্থে এই মাপামাপির কাজ ১০ কিলোমিটার গভীরের বেশি করা যায়নি। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপমাত্রা ২,৭৬০° সেন্টিগ্রেড (৫,০০০° ফারেনহাইট) বা আরো বেশি হতে পারে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ কতগুলো প্লেটের উপর ভাসছে?

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন প্লেটের উপর ভাসছে। আপাতভাবে যদিও মনে হয়, সব মাটি একসাথে লেগে আছে। কিন্তু এই মাটির নিচে রয়েছে বেশ কিছু প্লেট, যার নিচে আবার রয়েছে গরম লাভা। এই প্লেটগুলো নড়ে গেলে পৃথিবীর মাটি সরে যাবে। এখন পর্যন্ত ৮টি বড় আকারের প্লেট রয়েছে-

- উত্তর আমেরিকা প্লেট : আমেরিকা, উত্তর আটলান্টিকের পশ্চিম ভাগ ও গ্রিনল্যান্ড
- দক্ষিণ আমেরিকা প্লেট : দক্ষিণ আমেরিকা
- এন্টার্কটিক প্লেট : এন্টার্কটিকা ও "দক্ষিণ মহাসাগর"
- ইউরাশিয়ান প্লেট : ইউরোপ ও এশিয়া (ভারত বাদে)
- আফ্রিকান প্লেট : আফ্রিকা, ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগ
- ইন্ডিয়ান-অষ্ট্রেলিয়ান প্লেট : ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
- নাজকা প্লেট : দক্ষিণ আমেরিকার সাথে লাগানো প্যাসিফিকের পূর্বাঞ্চল
- প্যাসিফিক প্লেট : প্যাসিফিক মহাসাগর ও ক্যালিফোর্নিয়ার অংশ বিশেষ

পৃথিবীর পৃষ্ঠ কী দিয়ে তৈরী?

তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ খুবই তরুণ। ৫০ কোটি বছর ধরে পৃথিবী তার বিভিন্ন প্লেটগুলোর চাপ ও পরিবর্তনের ফলে নতুন করে পৃষ্ঠদেশ তৈরী করেছে। এর আগের কোনও ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে পৃথিবীর জন্মের প্রথম দিককার যাবতীয় তথ্য হারিয়ে গেছে। অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীর বয়স ৪.৫ থেকে ৪.৬ বিলিয়ন বৎসর। কিন্তু সবচে' পুরনো যে পাথরটি পাওয়া গেছে তার বয়স ৪ বিলিয়ন বৎসর। এবং ৩ বিলিয়ন বৎসর বয়সের পুরনো পাথর বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। এখন পর্যন্ত ৩.৯ বিলিয়ন বছর পুরনো জীবিত প্রাণীর মৃতদেহের ফসিল পাওয়া গেছে। তবে এটা ঠিক বলা যায় না যে, ঠিক কখন থেকে জীবন শুরু হয়েছিল।

নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ তৈরী। তবে এগুলোর সাথে নিকেল, কপার, লিড, জিঙ্ক, টিন এবং সিলভার রয়েছে শতকরা ০.০২ ভাগের মতো। আর অন্যান্য সকল উপাদান রয়েছে শতকরা ০.৪৮ ভাগ-

BanglaInternet.com

উপাদান	শতকরা ভাগ
অক্সিজেন	৪৭.০
সিলিকন	২৮.০
এলুমিনিয়াম	৮.০
আয়রন	৪.৫
ক্যালসিয়াম	৩.৫
ম্যাগনেসিয়াম	২.৫
সোডিয়াম	২.৫
পটাশিয়াম	২.৫
টাইটানিয়াম	০.৪
হাইড্রোজেন	০.২
কার্বন	০.২
ফসফরাস	০.১
সালফার	০.১

পৃথিবীর পৃষ্ঠে কতটুকু পানি আর মাটি?

পৃথিবীর শতকরা ৩০ ভাগ হলো ভূমি। অর্থাৎ ১৪৮,৩০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৭,২৫৯,০০০ বর্গ মাইল) জায়গা হলো ভূমি। আর পৃথিবীর জলভাগের পরিমাণ হলো শতকরা ৭০ ভাগ, অর্থাৎ ৩৬১,৮০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১৩৯,৬৯২,০০০ বর্গমাইল)।

এটা অনুমান করা হয় যে, পৃথিবীর শতকরা ৯৭ ভাগ (১,২৩৪ x ১০১৫ ঘন মিটার) পানি রয়েছে সাগরে। যদি পৃথিবীর তল সর্বত্র সমান হতো তাহলে এই পানি দিয়ে পুরো পৃথিবী ঢেকে যেতো এবং বসাবাসের কোনও ভূমি থাকতো না। পুরো পৃথিবী প্রায় ২৪৪ মিটার (৮০০ ফুট) পানির নিচে চলে যেতো।

আবার পৃথিবীতে মোট প্রায় ২৩ মিলিয়ন ঘনমিটার বরফ রয়েছে। এই বরফ যদি গলে যায় তাহলে সাগরের উচ্চতা শতকরা ১.৭ ভাগ বা ৬০ মিটার (১৮০ ফুট) বেড়ে যাবে। এবং এমনটা ঘটলে আমেরিকার এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর বিশতলা পানির নিচে চলে যাবে।

এখানে বলা যেতে পারে, প্যাসিফিক মহাসাগরের গভীরতা হলো ৪,১৮৮ মিটার, আটলান্টিকের গভীরতা ৩,৭৩৫ মিটার, ইন্ডিয়ান মহাসাগরের গভীরতা ৩,৮৭২ মিটার, আর্কটিকের গভীরতা ১,০৩৮ মিটার এবং সবার গড় গভীরতা হলো ৪,০০০ মিটার বা ১৩,১২৪ ফুট।

Banglainternet.com

পৃথিবীর কত অংশ তলদেশ জমে গেছে?

পৃথিবীর তলদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হলো পারমাফ্রস্ট বা পাকাপাকিভাবে জমে যাওয়া ভূমি। এটা ভূমির গঠন দিয়ে পরিমাপ করা হয়নি, এটা পরিমাপ করা হয়েছে তাপমাত্রা দিয়ে। এখানে মাটি, বালু, বরফ, কাদা, পাথর ইত্যাদি থাকতে পারে। এই সব জায়গায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে (ফ্রিজিং পয়েন্ট) অবস্থান করছে। তবে প্রায় সকল পারমাফ্রস্ট হলো হাজার বছরের পুরনো।

এন্টার্কটিকার বরফ কত ঘন?

যে বরফ এন্টার্কটিকাকে ঢেকে রেখেছে তার সর্বোচ্চ গভীরতা হলো ১৫,৭০০ ফুট (৪,৭৮৫ মিটার)। এটা পৃথিবীর সর্বোচ্চ ভবনটির চেয়ে প্রায় দশগুণ উঁচু। তবে গড়ে বরফের পুরুত্ব হলো ৭,১০০ ফুট (২,১৬৪ মিটার)।

এন্টার্কটিকা হলো পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম মহাদেশ, যার পুরোটাই হলো বরফ। এর ক্ষেত্রফল ৫.৪ মিলিয়ন বর্গমাইল (১৪ মিলিয়ন বর্গমিটার) যা পৃথিবীর মোট তলদেশের শতকরা ১০ ভাগ। সঠিক করে বলা যায় না, কে ওই মহাদেশে প্রথম পা ফেলেছিলেন। তবে ১৭৭৩-১৭৭৫ সালে বৃটিশ নাবিক জেমস কুক (১৭২৮-১৭৭৯) এন্টার্কটিকায় যান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ এই দক্ষিণ গোলার্ধে পৌছানোর চেষ্টা করেছেন। তবে নরওয়ের পর্যটক রোয়াল্ড এমান্ডসেন (১৮৭২-১৯২৮) হলেন প্রথম মানুষ যিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে দক্ষিণ মেরুতে (সাউথ পোল) পৌছান। এর ৩৪ দিন পর এমান্ডসেনের প্রতিপক্ষ রবার্ট ফ্যালকন স্কট (১৮৬৮-১৯১২) দক্ষিণ মেরুতে পা রাখেন। তবে তিনি ও তাঁর সহযাত্রীরা ফেরার সময় মারা যান।

আইস এজ কখন হয়েছিল?

আইস এজ বা বরফ যুগের আরেকটি নাম হলো গ্ল্যাসিয়াল পিরিয়ড। বিভিন্ন সময়ে থেমে থেমে প্রায় ২.৩ বিলিয়ন বৎসর ধরে এই বরফ যুগ চলে। অর্থাৎ বেশ কয়েকটি বরফ যুগ ঘটে গেছে। এই বরফ যুগে পৃথিবী বিভিন্ন স্তরের বরফ দিয়ে ঢেকে গিয়েছিল। তবে কেন পৃথিবীর আবহাওয়া এমনভাবে পাল্টে গিয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে অনেকে মনে করেন, সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিবর্তিত হয়েছিল। ফলে তাপমাত্রা কমে গিয়ে পানি বরফে পরিবর্তিত হয়।

সর্বশেষ যে বরফ যুগটি ছিল, তা শুরু হয় প্রায় ২ মিলিয়ন বৎসর আগে এবং শেষ হয় ১১,০০০ বৎসর আগে। একটা সময় বর্তমান পৃথিবীর শতকরা প্রায় ২৭ ভাগ বরফ দিয়ে ঢেকে যায়। উত্তর আমেরিকাতে এই বরফ কানাডাকে ঢেকে ফেলে এবং দক্ষিণে নিউ জার্সি পর্যন্ত চলে আসে। গ্রিনল্যান্ড বর্তমানে যেমন আছে বরফ যুগেও তাই ছিল। ইউরোপে এই বরফ স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে জার্মানি ও পোল্যান্ড পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। গ্ল্যাসিয়ার ঢেকে ফেলে উত্তর রাশিয়া, মধ্য এশিয়ার উপত্যকা আর সাইবেরিয়া।

Banglainternet.com

গ্ল্যাসিয়ারের প্রভাব এখনও আমেরিকাতে দেখা যায়। ওহিও নদীর প্রবাহ এবং বিশাল হ্রদগুলো এই গ্ল্যাসিয়ার দ্বারা প্রভাবিত। গ্ল্যাসিয়ারের দক্ষিণভাগ ইউটাহ, নাভাদা এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে বৃষ্টির পানিতে বিশাল আকৃতির হ্রদ তৈরী হয়েছে।

শেষ বরফ যুগ শেষ হয়েছে ১১,০০০ বছর আগে। তবে অনেকে মনে করেন, বরফ যুগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। গ্ল্যাসিয়ারগুলো একটা চক্র মেনে চলে এবং অনেকবার ফিরে ফিরে আসে। পৃথিবীর অনেক জায়গা এখন বরফ দিয়ে ঢাকা। বর্তমান সময়টা হয়তো গ্ল্যাসিয়ারগুলো এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি কোথায়?

মরুভূমি হলো এমন একটা জায়গা যেখানে খুব স্বল্প পরিমাণের গাছপালার অস্তিত্ব রয়েছে। ইকুয়েটরের প্রায় ২০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে অনেক মরুভূমি একটি ব্যান্ডের মতো তৈরী করেছে। কারণ যে বাতাসে পানির কণা থাকে, তা এখানে বৃষ্টি হিসেবে পতিত হয় না। পানির কণাবাহী বাতাস ইকুয়েটরের কাছাকাছি পৌঁছালে ওখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাতাস আরো উপরে উঠে যায়। এবং এক সময় যখন বাতাস ইকুটেরিয়ালের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন পৃথিবীর ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সংস্পর্শে আসে। তখন ঠাণ্ডা হয়ে বৃষ্টি আকারে মাটিতে পতিত হয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি সাহারা। এর আকার মেডিটেরিয়ান সাগরের চেয়ে তিনগুণ বড়। নিচে পাঁচটি বড় মরুভূমির অবস্থান দেয়া হলো।

মরুভূমি	স্থান	ক্ষেত্রফল (বর্গ কিলোমিটার)
সাহারা	উত্তর আফ্রিকা	৯,০৬৫,০০০
গবি	মঙ্গোলিয়া-চীন	১,২৯৫,০০০
কালাহারি	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৮২,৮০০
গ্রেট স্যান্ডি	অষ্ট্রেলিয়া	৩৩৮,৫০০
গ্রেট ভিক্টোরিয়া	অষ্ট্রেলিয়া	৩৩৮,৫০০

সকল ক্র্যাটার কি আগ্নেয়গিরির অংশ?

না, সকল ক্র্যাটার আগ্নেয়গিরির অংশ নয়। ক্র্যাটার হলো অর্ধ-গোলাকার একটি বিশাল আকৃতির গর্ত। মাটির নিচের লবণ বা লাইমষ্টোন গলে গেলে ভূমি ধ্বসে পড়তে পারে এবং তখন এমন একটি গোলাকার আকৃতি ধারণ করতে পারে। আবার মাটির নিচ থেকে অতিরিক্ত পানি তুলে ফেললে কিংবা গ্ল্যাসিয়ালের বরফ গলতে শুরু করলে ভূমি ধ্বসে ক্র্যাটার তৈরী হতে পারে।

BanglaInternet.com

তবে বড় আকারের মেটিওরাইট, ধূমকেতু এবং এস্টেরয়েড যদি পৃথিবীর মাটিকে আঘাত করে তাহলে ক্র্যাটার তৈরী হতে পারে। এমন একটি বিখ্যাত ক্র্যাটার হলো আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যেও উইঙ্গলো শহরে, যার নাম মেটিওর ক্র্যাটার। এর ব্যাস হলো ১২১৯ মিটার (৪,০০০ ফুট) এবং গভীরতা হলো ১৮৩ মিটার (৬০০ ফুট)। অনুমান করা হয় যে, প্রায় ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ বছর আগে এটা তৈরী হয়েছিল।

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত?

চাঁদের কক্ষপথ হলো উপবৃত্তাকার। তাই চাঁদ যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে, সেটা কখনও পৃথিবীর একটু কাছে চলে আসে, আবার কখনও দূরে সরে যায়। চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচে' কাছে থাকে তখন দূরত্ব হলো ২২১,৪৬৩ মাইল (৩৫৬,৩৩৪ কিলোমিটার); আবার যখন সবচে দূরে চলে যায় তখন দূরত্ব হলো ২৫১,৯৬৮ মাইল (৪০৫,৫০৩ কিলোমিটার)। তবে গড় দূরত্ব হলো ২৩৮,৮৫৭ মাইল (৩৮৪,৩৯২ কিলোমিটার)।

তবে এখানে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবী থেকে সব সময় চাঁদের একটি দিকই দেখা যায়। কখনই চাঁদের অন্য অংশটি দেখা যায় না।

চাঁদের ব্যাস ও পরিধি কত?

চাঁদের ব্যাস হলো ২,১৫৯ মাইল এবং এর পরিধি হলো ৬,৭৯০ মাইল। চাঁদ আকারে পৃথিবীর শতকরা ২৭ ভাগ।

নীল চাঁদ কি আসলেই নীল?

'নীল চাঁদ' নামে একটি শব্দ আছে। কিন্তু এই সময়ে চাঁদ কি আসলেই নীল রঙের হয়? তা কিন্তু নয়। একই মাসে যদি দুটি পূর্ণ চন্দ্র দেখা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বারের চাঁদটিকে বলে 'নীল চাঁদ'। গড়ে প্রায় ২.৭২ বছরে একবার নীল চাঁদ দেখা যায়। যেহেতু দুটো পূর্ণ চাঁদের মধ্যে পার্থক্য হলো ২৯.৫৩ দিন, তাই কখনই ফেব্রুয়ারি মাসে নীল চাঁদ দেখা যাবে না। খুব কদাচিৎ একটি বছরে দু'বার নীল চাঁদ দেখা যেতে পারে, এবং সেটাও আবার পৃথিবীর সকল স্থান থেকে নয়, বিশেষ বিশেষ কিছু জায়গা থেকে তা হতে পারে।

তবে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে কখনও চাঁদকে সত্যি সত্যি নীল দেখাতে পারে। যেমন ১৯৫০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর কানাডার গভীর বনে আগুন এতই ছড়িয়ে গিয়েছিল যে তা বায়ুমণ্ডলের অনেক উঁচুতে চলে গিয়েছিল এবং তখন চাঁদকে অনেকটা নীল দেখাচ্ছিল।

Banglainternet.com

চন্দ্রগ্রহণ হয় কেন?

পৃথিবী, সূর্য আর চাঁদ যদি একই রেখা বরাবর অবস্থান করে এবং পৃথিবীর একদিকে সূর্য, আর অপরদিকে চাঁদ থাকে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই অবস্থানে পৃথিবী সূর্যের আলোকে চাঁদে পৌঁছাতে দেয় না। ফলে পৃথিবী চাঁদকে সূর্য থেকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। এবং একটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদকে আকাশে দেখা যাবে না। একটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। যদি চাঁদের একটি অংশ পৃথিবী ঢেকে ফেলে, তাহলে সেটা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়। তবে পৃথিবীতে বসে চন্দ্রগ্রহণ বুঝতে পারা কঠিন। তখন যদি কেউ চাঁদে অবস্থান করে, তাহলে সেখানে দেখা যাবে, পৃথিবী সূর্য থেকে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে।

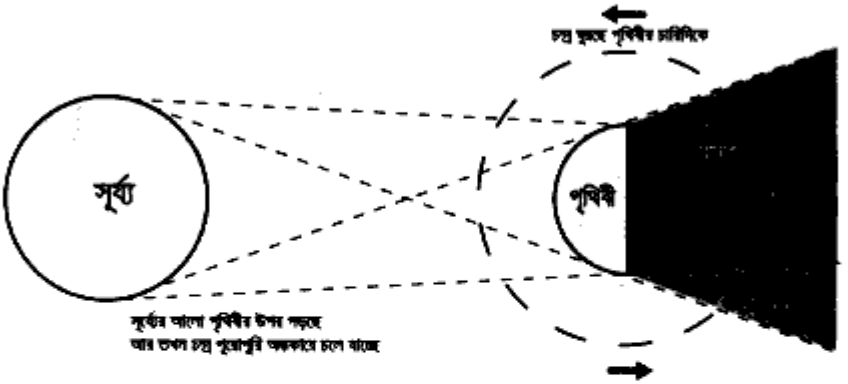

চন্দ্র গ্রহণ

জেনেসিস রক কী?

এপোলো-১৫ চাঁদ থেকে মাটি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল। সেই মাটিকে বলা হয় জেনিসিস রক। এই মাটি প্রায় ৪.১৫ বিলিয়ন বছরের পুরনো, যা চাঁদের মূল বয়স থেকে মাত্র ০.৫ বিলিয়ন বছর কম।

পৃথিবীর ভবিষ্যত

গ্রহগুলোর ভবিষ্যত পুরোপুরি নির্ভর করছে সূর্য্যের উপর। সূর্যের আলোর তীব্রতা খুব ধারাবাহিকভাবে বাড়তেই থাকবে এবং আশা করা হচ্ছে আগামী ১.১ বিলিয়ন বৎসরে (গিগা বছর) এটা বর্তমানের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বাড়বে। আবার ৩.৫ গিগাবছরে শতকরা ৪০ ভাগ বেড়ে যাবে। পৃথিবীর যে জলবায়ু মডেল আমাদের কাছে আছে সেটা পরীক্ষা করে বলা যায় যে, সেই রেডিয়েশনের কারনে পৃথিবীর সমুদ্রগুলো হারিয়ে যাবে।

Banglainternet.com

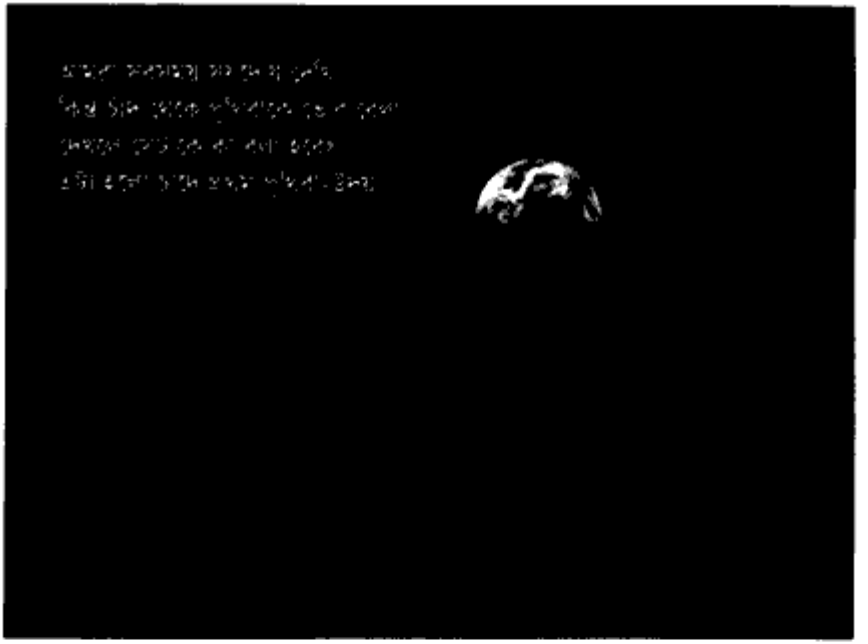

চাঁদ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি

জীবদ্দশায় ৫ গিগাবছরে সূর্য্য একটি বিশালাকার গোলাকার লাল পিণ্ডে পরিণত হবে। এবং সূর্য এতটাই বিশাল হয়ে যাবে যে, পৃথিবীর বর্তমান কক্ষপথের (১ এস্ট্রোনমিকাল ইউনিট) শতকরা ৯৯ ভাগ দখল করে নেবে। তবে তখন পৃথিবীর কক্ষপথও বেড়ে ১.৭ এস্ট্রোনমিকাল ইউনিট হয়ে যাবে। আর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর চক্রকে ত্বরান্বিত করবে।

আবার যদি সূর্যের কোনও পরিবর্তন নাও হয়, তবুও পৃথিবী তার নিজস্ব গতিতে তাপমাত্রা কমতে থাকবে। তাতে আমাদের আবহাওয়ামণ্ডল কমে যাবে এবং সমুদ্রগুলো হারিয়ে যাবে।

তবে এমনটা হতে পারে যে, পৃথিবীর কক্ষপথ আরো বাইরের দিকে সরে যাচ্ছে এবং গ্রীনহাউজ এফেক্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

Banglainternet.com

মহাশূন্যে মানুষ

Banglainternet.com

মহাশূন্যে মানুষ

লাইট ইয়ার কী?

আলোক বর্ষ বা লাইট ইয়ার কিন্তু সময়ের একক না, এটা দূরত্বের একক। শূন্যস্থানে আলোর গতি হলো প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,২৮২ মাইল (২৯৯,৭৯২ কিলোমিটার)। এই গতিতে আলো এক বছর (৩৬৫.২৫ দিন) চললে যতটা পথ অতিক্রম করতে পারবে, সেটাই হলো এক আলোক বর্ষ। এটার মান হলো ৫.৮৭ ট্রিলিয়ন মাইল (৯.৪৬ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার)।

সৌরজগতে দূরত্ব মাপতে এছাড়াও আরেকটি একক ব্যবহার করা হয়, তার নাম হলো এস্ট্রোনমিকাল ইউনিট। এক এস্ট্রোনমিকাল ইউনিট সমান হলো পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব বা ৯২,৯৫৫,৬৩০ মাইল (১৪৯,৫৯৭,৮৭০ কিলোমিটার)।

টেলিস্কোপ কী?

টেলিস্কোপ হলো একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে অনেক দূরের জিনিস কাছে দেখা যায়। সতেরশ' শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক অভ্যুত্থানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই টেলিস্কোপ। এটা যেন মানুষের চোখ ও বুদ্ধিরই একটি বাড়তি অংশ। ফলে এরিস্টোটলের মতো জ্ঞানী মানুষ যা কল্পনাও করতে পারেননি, সেটা একজন সাধারণ মানুষ টেলিস্কোপের মাধ্যমে অনায়াসেই দেখতে পারছেন। তবে এখানে একটি কথা না বললেই নয় যে, টেলিস্কোপ কিন্তু কোনও বিজ্ঞানীর তৈরী নয়; এটা হলো একজন ক্রাফটসম্যানের তৈরী। ক্রাফটসম্যানরা মূলত অশিক্ষিত মানুষ। তাই তাদের অনেক কিছুই ইতিহাস থেকে পরিষ্কারভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

BanglaInternet

কখন আউটার স্পেস ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয়?

১৯৬৭ সালের ২৩ জানুয়ারি জাতিসংঘের 'মহাকাশ চুক্তি' (আউটার স্পেস ট্রিটি) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে মহাকাশ কিভাবে একত্রে ব্যবহার করা যাবে এবং বিভিন্ন বিষয়াদি খুঁজে বের করা যাবে, তার উপর একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। মহাকাশে এবং চাঁদে কি কি কাজ করা যাবে এবং যাবে না, সেগুলো পরিষ্কার করে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেসকল দেশ মহাশূন্যে কোনও কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়, তারা এই নীতিমালা মেনে চলবে। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

নাসা কী?

নাসা হলো আমেরিকার 'ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস এডমিনিস্ট্রেশন' বিভাগের সংক্ষিপ্ত নাম। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার নাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সোভিয়েট রাশিয়া যখন প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট স্পুটনিক-১ মহাশূন্যে সফলভাবে পাঠালো, তখন আইজেনহাওয়ার আমেরিকার স্পেস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নাসা তৈরী করেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডি নাসার উপর আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ১৯৬০ সালের শেষদিকে চাঁদের মাটিতে মানুষ পাঠাতে সক্ষম হন। মার্কারি এবং জেমিনি নামের দুটো প্রকল্পের আওতায় নাসা চাঁদে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং দক্ষতা অর্জন করে। কেনেডির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে ২০ জুলাই ১৯৬৯ নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। এখন পর্যন্ত মাত্র ১২ জন নভোচারী চাঁদের মাটিতে হাঁটার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তারপর থেকে নাসা বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং স্পেস প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে আছে। পাশাপাশি নাসা প্রথম 'আবহওয়া' ও 'যোগাযোগ ব্যবস্থার' জন্য স্যাটেলাইট তৈরী করে।

নাসার বিখ্যাত প্রকল্প নভোযান এপোলোর পর 'স্পেস শাটল' তৈরীতে মনোনিবেশ করে। ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম ওই স্পেস শাটল ছাড়া হয়; এবং তারপর ১১২ টি সফল শাটল যাত্রা করে। ২০০০ সালে আমেরিকা ও রাশিয়া মহাশূন্যে 'আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন'-এ স্থায়ীভাবে মানুষ রাখতে শুরু করে। মানুষ স্থায়ীভাবে মহাশূন্যে থাকতে শুরু করে। ১৯৯৭ সালে নাসা 'মার্স পাথফাইন্ডার' নামে স্পেসক্রাফট মঙ্গলগ্রহে পাঠায়। এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় যে মঙ্গল গ্রহে কখনও জীবনের অস্তিত্ব ছিল কিনা? নাসার বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন নভোযান তৈরীর গবেষণায় ব্যস্ত।

Banglainternet.com

নাসার কেন্দ্রীয় অফিস আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি-তে অবস্থিত। এখান থেকেই দিক নির্দেশনা দেয়া এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ১০টি স্থাপনা রয়েছে যেখান থেকে প্রতিদিনকার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন কী?

আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন হলো ইতিহাসের সবচে বড় এবং জটিল আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রকল্প। পুরো পৃথিবীতে এমন আকারের কাজ আর কখনও হয়নি। এটা যেন এই গ্রহটির একটি বাড়তি অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মোট ১৫টি দেশ মিলে মহাশূন্যে তৈরী করেছে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন। এই দেশগুলো হলো - আমেরিকা, কানাডা, জাপান, রাশিয়া, ব্রাজিল এবং ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সিভূক্ত ১০টি দেশ (বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ড)।

মহাশূন্যে এই স্টেশনটি রাশিয়ার পাঠানো মির স্পেস স্টেশনের চেয়ে চারগুণ বড় এবং এর ভর হলো ১,০৪০,০০০ পাউন্ড। এটা দৈর্ঘ্যে ২৯০ ফুট এবং ৩৫৬ ফুট চওড়া। কিন্তু এর সাথে লাগানো আছে এক একরের মতো বিশাল সোলার প্যানেল। এই সোলার প্যানেল দিয়ে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করা হয়, যা দিয়ে ছয়টি অত্যাধুনিক ল্যাব পরিচালিত হবে। এই স্টেশনটি ৩৬০ কিলোমিটার (২২০ মাইল) উপরে কক্ষপথে ৫১.৬ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করছে। এই স্টেশন থেকে পৃথিবীর শতকরা ৮৫ ভাগ দেখা যায়।

এই স্টেশনটির পরিচালনার মূল দায়িত্ব নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৫টি দেশের প্রতিটিতেই কিছু না কিছু অংশ তৈরী হয়েছে। যেমন আমেরিকা তৈরী করেছে মূল কাঠামো, মূল গবেষণাগার, সোলার সিস্টেম, হ্যাবিটেশন মডিউল, লাইফ সাপোর্ট, নেভিগেশন সিস্টেম, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পৃথিবীর মাটিতে বসে নিয়ন্ত্রণ করার যন্ত্রপাতি এবং উড্ডয়নের জন্য ব্যবস্থাসহ আরো অনেক কিছু। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার জন্য কানাডা তৈরী করে দিয়েছে ৫৫ ফুট লম্বা একটি রোবট হাত। যে স্পেস শাটলটি এই স্টেশনটিকে কক্ষপথ পর্যন্ত নিয়ে যাবে তার জন্য একটি গবেষণাগার তৈরী করে দিয়েছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। স্টেশনে বসে গবেষণা করার জন্য জাপান তৈরী করে দিয়েছে একটি গবেষণাগার। রাশিয়া করে দিয়েছে দুটি গবেষণা মডিউল। একটি হলো 'সার্ভিস মডিউল' যা নিজেই নিজের ত্রুটি সারাতে সক্ষম। আরেকটি হলো সোলার সিস্টেম যা ২০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। এছাড়া ব্রাজিল ও ইতালি কিছু কিছু যন্ত্রাংশ তৈরী করে দিচ্ছে।

১৯৮০ সালে নাসা চিন্তা করে মহাশূন্যে একটি স্টেশন করার। রাশিয়া ইতোমধ্যেই স্পেস স্টেশন 'মির' তৈরী করে বসে আছে। আমেরিকার এই কল্পনা কখনই ড্রয়িং বোর্ডের গণ্ডি পেরিয়ে কোথাও যায়নি। এবং রাশিয়ার সাথে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর এই প্রজেক্ট বাতিল করে দেয়া হয়। তারপর ৯০ দশকের শুরু

BanglaInternet.com

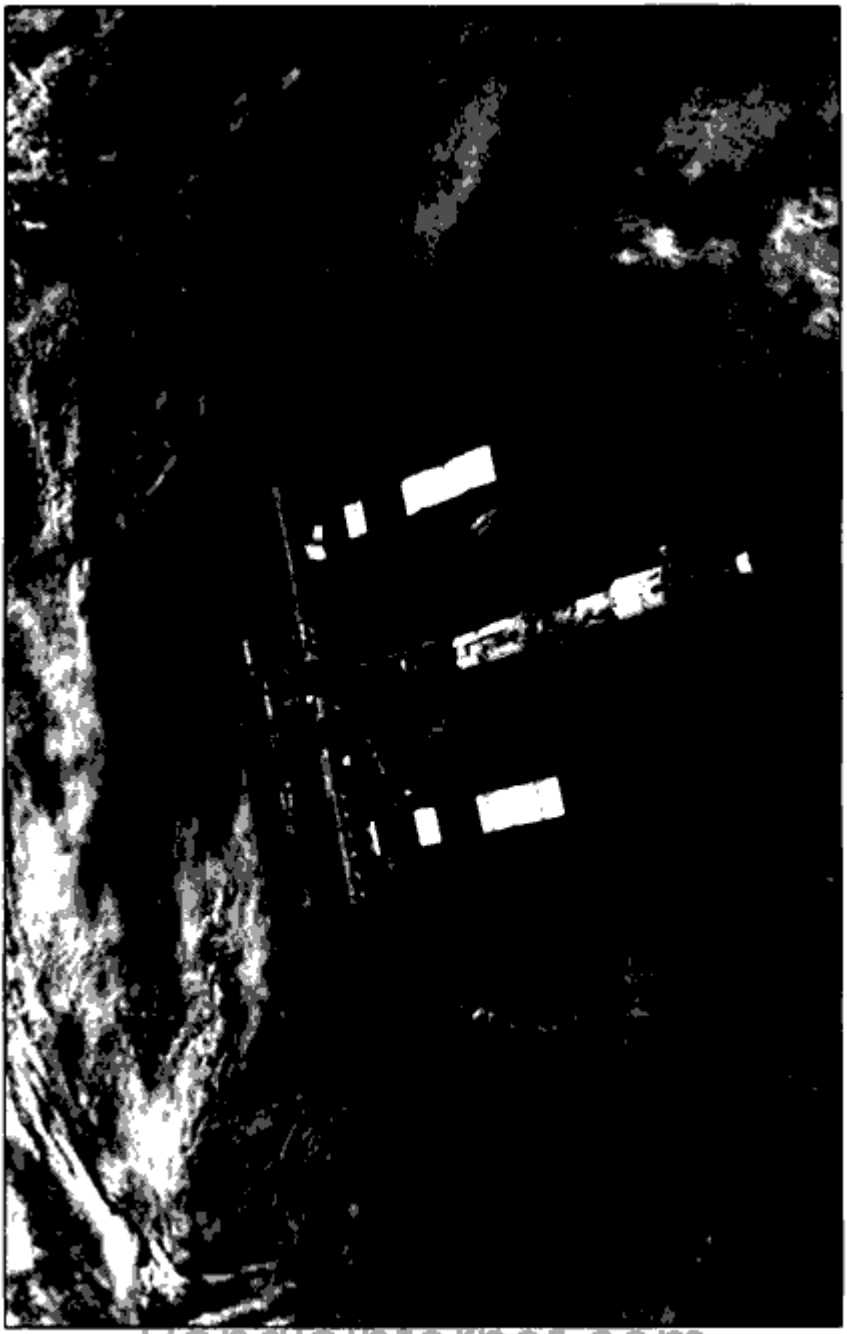

BanglaInternet.com

দিকে এই প্রজেক্টের আবার সূত্রপাত হয়। তবে এবারে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে নয়, এবারে সত্যি সত্যি একটি আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন করার চিন্তা নিয়ে রাশিয়া, কানাডা, জাপান ও ইউরোপের সাথে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে প্রথম এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা দেয়া হয় এবং নামকরণ করা হয় 'স্পেস স্টেশন আলফা'। এই প্রকল্পের অধীনে সবগুলো দেশের নিজস্ব আলাদা স্পেস স্টেশন তৈরী না করে, সবগুলো মিলিয়ে একটি সাধারণ স্টেশন করার প্রস্তাব করা হয়। পুরো নব্বই দশক ধরে এর পরিকল্পনা চলে। বর্তমানে যে স্টেশনটি তৈরী করা হচ্ছে তা প্রথম পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি অনুমান করেছিল যে, ৮০ দশকের শেষদিকে প্রকল্পটি শুরু হয়ে তা শেষ হবে ২০১৬ সালে এবং খরচ হবে ১০০ বিলিয়ন ইউরো।

প্রায় দুই বছর নভোচারীরা মির স্পেস স্টেশনে ছিল। সেখান থেকে তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এবং মানুষ যে মহাশূন্যে গিয়ে দীর্ঘদিন যাপন করতে পারবে সেই বিশ্বাস তৈরী হয়েছে। সাতজন আমেরিকার নভোচারী সবাই মিলে মোট ৩২ মাস ধরে মিরে ছিলেন। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন তৈরীর মোট খরচের শতকার ২ ভাগ খরচ করে নাসা মির থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এছাড়া এই প্রকল্প বাস্তবে কখনই রূপ পেতো না।

বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ে আসা হয় 'কেনেডি স্পেস সেন্টারে'। আর সার্ভিস মডিউলটি রাশিয়া তৈরী করে তাদের কাজাখস্তান স্পেস সেন্টার থেকে উড্ডয়ন করে। তারপর যাবতীয় যন্ত্রপাতি মহাশূন্যে কক্ষপথে নিয়ে গিয়ে সেখানে জোড়া দিয়ে লাগানো হবে। এর থেকে জটিল কাজ আর কী হতে পারে?

এই স্টেশনের প্রথম অংশ 'জারিয়া ফাংকশনাল কার্গো ব্লক' কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। ২০ নভেম্বর ১৯৯৮ এই স্টেশনের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য অংশগুলো সেখানে গিয়ে লাগানো হয়। ২ নভেম্বর ২০০০ সালে প্রথম মানুষ প্রবেশ করে এই স্টেশনে। প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ২০০৪/২০০৫ সালের মধ্যেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ২০০৩ সালে কলাম্বিয়া শাটলের দূর্ঘটনার পর নাসা যাবতীয় স্পেস শাটল উড্ডয়ন বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ আড়াই বছর কোনও স্পেস শাটল আকাশে ওড়েনি। তারপর ২০০৫ সালে এস.টি.এস-১১৪ স্পেস শাটলে কলম্বিয়ার মতো ত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে এখানে আবার কাজ পিছিয়ে যায়। ফলে এখনও এই স্টেশনের কাজ চলছে। ২০০৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মাত্র তিনজন লোকের স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে ছয়জনের থাকার ব্যবস্থা করার কথা। আশা করা হচ্ছে আগামী ২০১০ সালে এর কাজ পুরোপুরি শেষ হবে।

আন্তর্জাতিক এই স্পেস স্টেশনে বেশ কিছু গবেষণা কাজ পরিচালিত হবে। যেমন, প্রোটিন ক্রিস্টাল স্টাডি, টিস্যু কালচার, অল্প মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে জীবন কী আচরণ করে, মহাশূন্যে আগুন ও তরলের বৈশিষ্ট্য, মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে প্রতিনিয়ত দেখে রাখার মতো অনেক কাজই হবে।

BanglaInternet.com

কেনেডি স্পেস সেন্টার বিখ্যাত কেন?

আমেরিকার ফ্লোরিডা রাজ্যে অবস্থিত কেনেডি স্পেস সেন্টার। মানুষবাহী সকল নভোযান, প্রথম দিকের সেই মার্কারি প্রজেক্ট থেকে শুরু করে স্পেস শাটল পর্যন্ত, পরবর্তী প্রজন্মের নভোযান, এমনকি আমাদের এই সৌরজগতের বাইরে পাঠানোর জন্য যাবতীয় নভোযান এই স্থান থেকেই উড়ে যায়। ১ জুলাই ১৯৬২ সালে এই স্পেস সেন্টারটি তৈরী করা হয়। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে এটা স্পেসপোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং মজার ব্যাপার হলো, এই স্টেশন থেকে জনসাধারণ ইচ্ছে করলে নভোযান উড্ডয়ন ও অবতরণ দেখতে পারেন। ইদানিং নিরাপত্তার কারণে এই ব্যবস্থা একটু কড়াকড়ি করা হয়েছে। তবে এখনও নির্দিষ্ট সংখ্যায় টিকিট বিক্রি করা হয়। ফলে দর্শকদের জন্য নির্ধারিত এলাকা থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এটা হলো পৃথিবীতে বসে দেখার মতো সবচে নাটকীয় একটি ঘটনা।

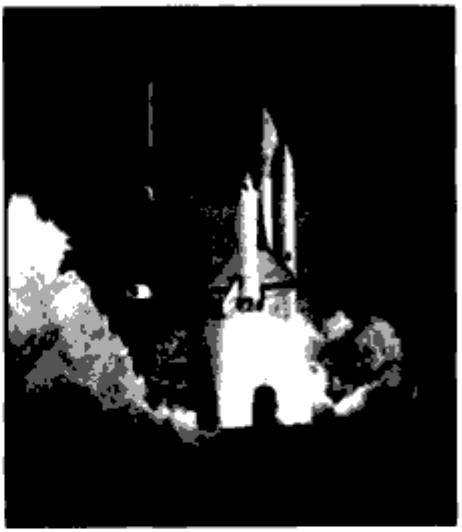

কেনেডি স্পেস সেন্টার

মহাশূন্যে প্রথম মানুষ কে?

সোভিয়েট নাগরিক ইউরি গেগারিন হলেন মহাশূন্যে প্রথম মানুষ। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল তিনি ভস্টক-১-এ চড়ে পৃথিবীকে পূর্ণ প্রদক্ষিণ করেন। তার এই ভ্রমণের সময় ছিল মাত্র ১ ঘন্টা ৪৮ মিনিট। যদিও খুবই স্বল্প সময়ের ভ্রমণ; তবুও মহাশূন্যে প্রথম মানুষ হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে নায়ক হয়ে যান। রাশিয়ার এই সাফল্যের ফলেই আমেরিকা ক্ষেপে যায়। এবং ২৫ মে ১৯৬১ সালে, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডি ঘোষণা দেন যে, ওই দশকের মধ্যেই আমেরিকা চাঁদে মানুষ পাঠাবে। এবং সেই লক্ষ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে আমেরিকা প্রথম মহাশূন্যে সফলভাবে মানুষ পাঠাতে সমর্থ হয়।

ইউরি গেগারিন

BanglaInternet.com

ভয়েজারে কী ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছিল?

ভয়েজার-১ এবং ভয়েজার-২ মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল মানুষহীন। এবং এগুলো তৈরীই করা হয়েছিল গ্রহমণ্ডলের বাইরে যাওয়া ও সৌরজগতের বাইরে ভ্রমণ করার জন্য। এই স্পেস-শাটলটি এক্সট্রাটেরিষ্ট্রিয়াল কোনও সভ্যতার মুখোমুখি হলে যেন যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য স্বর্ণ-প্রলেপ দেয়া কপারের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডে একটি ম্যাসেজ পাঠানো হয়েছিল। সেই রেকর্ড পৃথিবীর শব্দ ও ভিডিও চিত্র ধারণ করেছিল। তাছাড়া যে সভ্যতা মহাশূন্যে এই যানটি পাঠিয়েছে তাদের সম্পর্কেও তথ্য দেয়া হয়েছিল।

সেই রেকর্ডে ১১৮ টি ছবি ছিল। সেই ছবিগুলোতে গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা, সূর্য, সৌরজগতের গ্রহসমূহ, মানুষের জীবনধারণ ও প্রজনন প্রক্রিয়া, ভূমির গঠন (সমুদ্রতীর, মরুভূমি, পাহাড় ইত্যাদি), প্রাণীদের জীবন, বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ, বিখ্যাত ষ্ট্রাকচার (তাজমহল, সিডনীর অপেরা হাউজ ইত্যাদি), যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাহন, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, গাড়ি, উড়োজাহাজ, স্পেস-শাটল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হয়।

এই ছবিগুলোর পরই ছিল, তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার এবং জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের স্বাগত বাণী। পাশাপাশি পৃথিবীর ৫৪ ভাষায় সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছাবাণী দেয়া হয়।

তারপরের অনুচ্ছেদে পৃথিবীর সাধারণ কিছু শব্দ দেয়া হয়। যেমন, বজ্রপাতের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, বাতাস, আগুনের শব্দ, কুকুরের চিৎকার, পায়ে চলার শব্দ, হাসির শব্দ, মানুষের বক্তৃতা, শিশুর কান্না, মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দেনের শব্দ এবং মস্তিষ্কের তরঙ্গ ইত্যাদি।

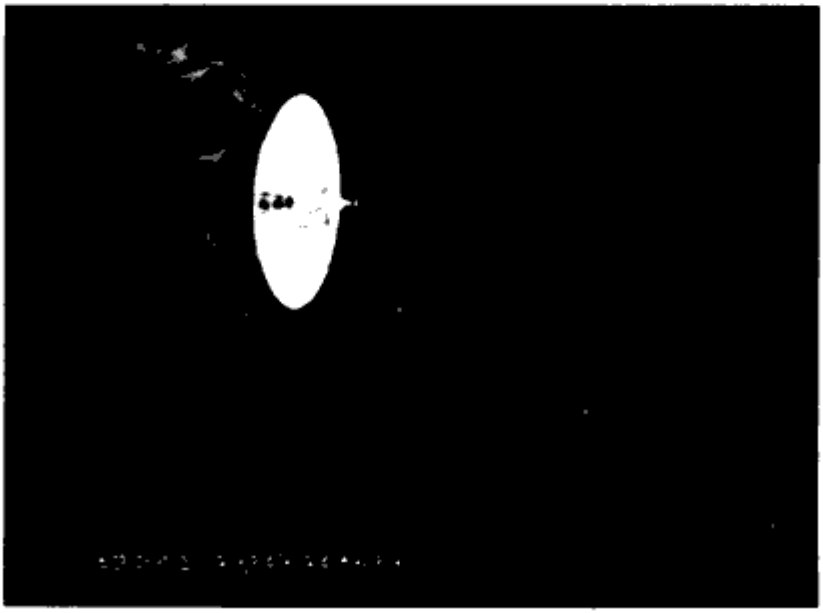

রেকর্ডটির শেষ অংশে ৯০ মিনিটের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। তার নামকরণ হলো, 'আর্থ গ্রেটেষ্ট হিটস'। সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির গান স্থান পায়।

একটি তারার কাছাকাছি পৌঁছাতে ভয়েজারের হয়তো শত শত বছর লেগে যাবে। হয়তো ওই ম্যাসেজগুলো কখনই কেউ শুনতে পাবে না। কিন্তু তারপরেও মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের উৎস খুঁজতে মানুষের আশা ও প্রচেষ্টার একটি চমৎকার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

কোন নভোচারীরা চাঁদের মাটিতে হাটেন?

১২ জন নভোচারী চাঁদের মাটিতে হাঁটার সুযোগ পান। প্রতিটি এপোলো ফ্লাইটে তিনজন করে নভোচারী ছিলেন, যাদের একজন নভোযানেই (কমান্ড সার্ভিস মডিউল - সি.এস.এম) রয়ে গেছেন আর বাকী দু'জন চাঁদের মাটিতে নেমেছেন।

এপোলো-১১, জুলাই ১৬-২৪, ১৯৬৯
নীল আর্মষ্ট্রং
এডউইন অলড্রিন
মাইকেল কলিন্স (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)
এপোলো-১২, নভেম্বর ১৪-২৪, ১৯৬৯
চার্লস কনরাড
এলান বিন
রিচার্ড গর্ডন (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)
এপোলো-১৪, জানুয়ারি ৩১-ফেব্রুয়ারি ৯, ১৯৭১
এলান শেপার্ড
এডগার মিশেল
স্টুয়ার্ট রুসা (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)
এপোলো-১৫, জুলাই ২৬-আগষ্ট ৭, ১৯৭১
ডেভিড স্কট
জেমস আরউইন
আলফ্রেড গর্ডন (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)
এপোলো-১৬, এপ্রিল ১৬-২৭, ১৯৭২
জন ইয়াং
চার্লস ডিউক
থমাস ম্যাটিংলি (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)
এপোলো-১৭, ডিসেম্বর ৭-১৯, ১৯৭২
ইউজেন কারনেন
হ্যারিসন স্কিমট
রনাল্ড ইভান্স (সিএসএম পাইলট, যিনি চাঁদে হাঁটেননি)

BanglaInternet.com

অলড্রিন প্রথম চাঁদে হাটছেন

কক্ষপথে প্রথম কখন পশু পাঠানো হয়?

নভেম্বর ৩, ১৯৫৭ সালে সোভিয়েট নভোযান স্পুটনিক-২ পাঠানো হয়, যার সাথে যাত্রী হিসেবে যায় 'লাইকা' নামের একটি কুকুর। এর আগে অক্টোবর ৪, ১৯৫৭ সালে সফলভাবে পাঠানো হয় স্পুটনিক-১। এটাই ছিল মানুষের তৈরী প্রথম স্যাটেলাইট যা পৃথিবীর কক্ষপথে ছাড়া হয়। স্পুটনিক-১-এর সাফল্যের পর জীবন্ত প্রাণীসহ স্পুটনিক-২ পাঠানো হয়। লাইকা ছিল ছোট একটি মাদী কুকুর এবং কক্ষপথে প্রথম প্রাণী। একটি বিশেষ চ্যাম্বারে করে তাকে পাঠানো হয়েছিল, যার ওজন ছিল ১,১০৩ পাউন্ড। কিছুদিন কক্ষপথে থাকার পর লাইকা মারা যায়। এবং এপ্রিল ১৪, ১৯৫৮ সালে স্পুটনিক পৃথিবীতে ফিরে আসে।

লাইকা নামের কুকুর

BanglaInternet.com

মহাশূন্যে প্রথম বানর এবং শিম্পাঞ্জি কোনটি?

ডিসেম্বর ১২, ১৯৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নভোযান জুপিটারে একটি ছোট বানর পাঠানো হয়েছিল। তবে সেটা কক্ষপথ পর্যন্ত যায়নি। মে ২৮, ১৯৫৯ সালে আরেকটি জুপিটারে দুটো মেয়ে বানর পাঠানো হয়েছিল। তাদেরকে ৩০০ মাইল উঁচুতে পাঠানো হয়েছিল। দুটি বানরই জীবিত পৃথিবীতে ফিরে আসে।

জানুয়ারি ৩১, ১৯৬১ সালে মার্কারি নামের একটি নভোযানে হ্যাম নামক একটি শিম্পাঞ্জি পাঠানো হয়েছিল। হ্যামকে ১৫৭ মাইল উঁচুতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু কক্ষপথ পর্যন্ত যায়নি। যে ক্যাপসুলে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ৫,৮৫৭ মাইল/ঘণ্টা; এবং নামার সময় ৪২২ মাইল/ঘণ্টা। ওই ক্যাপসুলটি আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়েছিল। তবে হ্যামকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা যায়।

নভেম্বর ২৯, ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইনোস নামের একটি শিম্পাঞ্জিকে কক্ষপথে পাঠাতে সক্ষম হয়। এবং দুটি পূর্ণ প্রদক্ষিণের পর পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়। রাশিয়ানরা পাঠাতো কুকুর; আর আমেরিকা পাঠিয়েছিল শিম্পাঞ্জি। প্রকৃত মানুষ পাঠানোর আগে এই জীবিত প্রাণী পাঠিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল।

চাঁদে অবতরণ করে প্রথম কী শব্দ উৎচারণ করা হয়?

২০ জুলাই ১৯৬৯, ইষ্টার্ন সময় বিকাল ৪:১৭:৪৩ টায় (গ্রিনিচ সময় ২০:১৭:৪৩) নীল আর্মষ্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিন দুজন লুনার মডিউল ঈগল নিয়ে চাঁদের 'সি অফ ট্রাংকুয়ালিটি'-তে অবতরণ করেন। তখন রেডিওতে নীল আর্মষ্ট্রং বলেন, 'হিউষ্টন, ট্রাংকুয়ালিটি বেস থেকে বলছি। ঈগল অবতরণ করেছে ("Houston, Tranquility base here. The Eagle has landed"). কয়েক ঘন্টা পর তিনি লুনার মডিউল থেকে যখন চাঁদের মাটিতে লাফিয়ে পড়েন তখন বলেন, 'একটি মানুষের জন্য ওই ছোট একটি লাফ, মানবজাতির জন্য বিশাল এক পদক্ষেপ।' ("that's one small step for man, one giant leap for mankind.") যখন সরাসরি শব্দ পাঠানো হয়েছিল তখন একটি 'a', বর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে সেটা ঠিক করে সঠিকভাবে রেকর্ড করা হয় এভাবে - "one small step for a man".

চাঁদে প্রথম খাবার কী ছিল?

আমেরিকার নভোচারী নীল আর্মষ্ট্রং এবং এডউইন অলড্রিন চাঁদে নেমে যে খাবার খান তাহলো - শূকরের চার টুকরো মাংস, তিনটি কুকি বিস্কুট, পিচ ফল, কমলা আর আঙ্গুরের মেশানো জুস এবং কফি। ২০ জুলাই ১৯৬৯ সালে চাঁদের মাটিতে ঐতিহাসিক সেই হাঁটার প্রাক্কালে তারা এই খাবার খেয়েছিলেন।

Banglainternet.com

মহাশূন্যে প্রথম নারী কে?

রাশিয়ার নভোচারী ভেলেনটিনা ভি. টেরেশকোভা-নিকোলায়েভা (জন্ম ১৯৩৭ সাল) হলেন মহাশূন্যে প্রথম নারী। ১৬ জুন ১৯৬৩ সালে ভস্টক-৬ নভোযানে চড়ে তিনি মহাশূন্যে যান। তিনি ৩ দিন মহাশূন্যে থেকে পৃথিবীকে ৪৮ বার প্রদক্ষিণ করেন।

এর ২০ বছর পর আমেরিকা কোনও নারীকে মহাশূণ্যে পাঠায়। ১৮ জুন ১৯৮৩ সালে চ্যালেঞ্জারে চড়ে স্যালি কে. রাইড মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন। ১৯৮৭ সালে তাঁকে নাসার এডমিনিস্ট্রেশন দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। এবং তিনি নাসার ভবিষ্যৎ মিশন ও তার দিকনির্দেশনা দেয়ার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯৮৭ সালেই তিনি নাসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, স্যান ডিয়েগোতে ক্যালিফোর্নিয়া স্পেস ইনষ্টিটিউটে ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন।

অন্যান্য ক্রুদের সাথে স্যালি রাইড

কবে প্রথম স্যাটেলাইট পাঠানো হয়?

৪ অক্টোবর, ১৮৫৭ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন কাজাখস্তানের বৈকনুর থেকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠায়। এই স্যাটেলাইটের নাম স্পুটনিক-১ এবং ওজন ১৮৪ পাউন্ড (৮৩.৫ কেজি)। এটা নিচের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। সেই স্যাটেলাইটে ২০ ও ৪০ মেগাহার্জটের তরঙ্গ পাঠানোর জন্য ট্রান্সমিটার বসানো হয়, যেন সবাই বুঝতে পারে স্যাটেলাইটটি আসলেই উপরে অবস্থিত। ৬ মাস শূন্যে থাকার পর এটাকে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। যে রকেটটি এটাকে টেনে

BanglaInternet.com

মহাশূন্যে নিয়ে যায় তার ওজন ছিল ৪ টন, এটাও কক্ষপথ পর্যন্ত গিয়েছিল এবং পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান ছিল। এরপর ৩ নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে পাঠানো হয় স্পুটনিক-২ (ওজন ১১০০ পাউন্ড) এবং এর সাথে লাইকা নামের একটি কুকুরও পাঠানো হয়েছিল। শেষ স্পুটনিক পাঠানো হয় ১৫ মে, ১৯৫৮ সালে। পৃথিবীর উচু স্তরের আবহাওয়ার ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য এই স্যাটেলাইট পাঠানো হয়। এটা দু'বছর কক্ষপথে থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

রাশিয়া মহাশূন্যের এই গবেষণা কাজগুলো করে যখন রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছিল। রাশিয়ার এই সাফল্যে আমেরিকা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন সিনেটর লিনডেন জনসন বলেন, স্পেসকে জয় করতে রাশিয়া আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। একটি সিনেমায় এটা নিয়ে বেশ রসিকতাও করা হয়। সেখানে দেখানো হয় সিনেটর বলছেন, "রাস্তার উপর ব্রিজ থেকে শিশুরা যেমন গাড়ির উপর পাথর ছুঁড়ে ফেলে, রাশিয়াও মহাকাশ থেকে একইভাবে আমাদের উপর বোমা ফেলতে থাকবে।" এবং তখন আমেরিকার জনগণকে বারবার এই বিষয়ে ভয় দেখানো হয়। খবরের কাগজে হেডলাইন আসে "সোভিয়েট স্যাটেলাইট প্রতি ৯০ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে"। আমেরিকা স্পেস প্রযুক্তিকে তাদের জাতীয় প্রাইয়োরিটিতে নিয়ে আসে। রাশিয়ার প্রথম স্যাটেলাইট পাঠানোর চার মাস পর ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে আমেরিকা এক্সপ্লোরার-১ নামের একটি স্যাটেলাইট পাঠায়, যার ওজন হলো মাত্র ৩১ পাউন্ড (১৪.০৬ কেজি)। এটি উঁচু কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

Banglain

গ্যালিলিও স্পেসক্রাফটের উদ্দেশ্য কী?

১৮ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে গ্যালিলিও নভোযান ছাড়া হয়। ভেনাসকে একবার এবং পৃথিবীকে দু'বার প্রদক্ষিণ করে এটি প্রায় ছয় বছরে জুপিটারের কাছাকাছি পৌছায়। জুপিটার, এর চারদিকের রিং এবং জুপিটারের চাঁদগুলোর উপর বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এই নভোযান পাঠানো হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে এটি জুপিটারের আবহাওয়া মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের তথ্য পাঠিয়েছে। এছাড়াও জুপিটারের চারটি বড় চাঁদের উপরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মহাশূন্যে কতজন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন?

নিচের ১৪ জন নভোচারী বিভিন্ন সময় মহাকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

তারিখ	নভোচারীর নাম	মিশন
জানুয়ারি ২৭, ১৯৬৭	রজার শ্যাফি (আমেরিকা)	এপোলো ১
জানুয়ারি ২৭, ১৯৬৭	এডওয়ার্ড হোয়াইট (আমেরিকা)	এপোলো ১
জানুয়ারি ২৭, ১৯৬৭	ভার্জিল 'গাস' গ্যারিসন (আমেরিকা)	এপোলো ১
এপ্রিল ২৪, ১৯৬৭	ভ্লাদিমির কমারভ (রাশিয়া)	সয়ুজ ১
জুন ২৯, ১৯৭১	ভিক্টর প্যাটসায়েভ (রাশিয়া)	সয়ুজ ১১
জুন ২৯, ১৯৭১	ভ্লাদিসলাভ ভলকভ (রাশিয়া)	সয়ুজ ১১
জুন ২৯, ১৯৭১	জর্গী ডব্রোভলস্কি (রাশিয়া)	সয়ুজ ১১
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	গ্রেগরি জার্ভিস (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	ক্রিষ্টা ম্যাকআউলিফ (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	রনাল্ড ম্যাকন্যার (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	ইলিসন অনিজুকা (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	জুডিথ রেসনিক (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	ফ্রান্সিস স্কোবি (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল
জানুয়ারি ২৮, ১৯৮৬	মাইকেল স্মিথ (আমেরিকা)	এসটিএস ৫১এল

শ্যাফি, হোয়াইট ও গ্যারিসন এপোলো-১-এ পরীক্ষামূলক আগুন পরিচালনার সময় কেবিনে আগুন ধরে মারা যান। ক্যাপসুলের প্যারাসুট কাজ না করায় সয়ুজ-১ নভোযানে কমারভ মারা যান। প্যাটসায়েভ, ভলকভ ও ডব্রোভলস্কি মারা যান ভুল ক্রমে তাদের ক্যাপসুল থেকে আবহাওয়া বের করে নেওয়া হয়। জার্ভিস, ম্যাকআউলিফ, ম্যাকনার, অনিজুকা, রেসনিক, স্কোবি ও স্মিথ মারা যান যখন স্পেস শাটল চ্যালেঞ্জার এসটিএস-৫১এল উড্ডয়নের ৭৩ সেকেন্ডের মাথায় বিস্ফোরিত হয়।

BanglaInternet.com

এছাড়াও আরো ১৯ জন নভোচারী বিভিন্ন সময়ে মহাকাশ সংক্রান্ত নয় এমন দুর্ঘটনায় মারা যান। এদের মধ্যে ১৪ জন মারা যান বিমান দুর্ঘটনায়, ৪ জন স্বাভাবিক মৃত্যু এবং ১ জন গাড়ি দুর্ঘটনায়।

আমেরিকার সবচে খারাপ দুর্ঘটনা কোনটি?

চ্যালেঞ্জারের মিশন এসটিএস-৫১এল হলো আমেরিকার স্পেস কার্যক্রমের সবচে খারাপ দুর্ঘটনা। এটি ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে উড্ডয়নের মাত্র ৭৩ সেকেন্ড পরেই বিস্ফোরিত হয়। ওই মিশনের ৭ জন ক্রুর সবাই তখুনি মারা যান, এবং নভোযানটিও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তদন্তে বের হয়ে আসে যে, দুর্ঘটনার মূল কারণ হলো নিচের দিকে ডান পাশে রকেট মোটরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তদন্তে কোনও ব্যাক্তিকে দায়ী করা না হলেও মানুষ মনে করেন, ওই দিন নভোযানটি উড্ডয়ন ঠিক হয়নি। ওই দিন আবহাওয়া ছিল অসম্ভব রকম শীতল এবং রাতের তাপমাত্রা ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে নেমে গিয়েছিল। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় সেই সংযোগের কার্যকারিতা কমে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়।

সোভিয়েট মহাকাশ কার্যক্রম কতটা শক্তিশালী?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন ২ কোটি জীবন হারিয়েছিল। এবং এর দ্বারা সবচে' বেশি আক্রান্ত হয়েছিল ঘনবসতি এলাকাগুলো। এটা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য সবচে তিক্ত একটি অভিজ্ঞতা। তখন থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের জাতিকে বিশেষ করে সামরিক বাহিনীকে আরো আধুনিক করে তুলবে। তারা রকেট, পারমানবিক অস্ত্র বানাবে এবং শত্রুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেবে। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে তারা আর-৭ নামের আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালাষ্টিক মিসাইল (সংক্ষেপে আইসিবিএম) বানাতে সক্ষম হয়। এই মিসাইল প্রায় ৫ টনের মতো ওজন নিয়ে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে গিয়ে আঘাত হানতে সক্ষম ছিল। যদিও এটা তৈরী করা হয়েছিল সামরিক কাজে, কিন্তু এটাই হয়ে গেল পরবর্তীতে মহাকাশে পাড়ি জমাবার চমৎকার বাহন।

৩১ শে জুলাই ১৯৫৬ সালে আমেরিকা ঘোষণা দিল যে, তারা মহাশূন্যে স্যাটেলাইট পাঠাবে। আমেরিকার এই ঘোষণায় রাশিয়া যেন আরো তীব্র হয়ে উঠলো। এই ঘোষণার মাত্র দু'দিন পরেই রাশিয়াও একই বিষয় ঘোষণা করলো। তারপর সেই ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চলে একটানা প্রতিযোগিতা, যা এই পৃথিবীর মহাকাশ কার্যক্রমে বিভিন্ন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

- প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালাস্টিক মিসাইল, আর-৭ সেমাইওর্কা

Banglainternet.com

- প্রথম কৃত্রিম স্যাটেলাইট, স্পুটনিক
- প্রথম প্রাণী যা কক্ষপথে প্রবেশ করেছে, স্পুটনিক-২-এ লাইকা
- প্রথম মানুষ মহাশূন্যে এবং কক্ষপথে, ইউরি গ্যাগারিন
- প্রথম নভোযান যা দু'জন মানুষ বহন করতে পারে, ভোস্টক-৩ এবং ভোস্টক-৪
- প্রথম নারী মহাশূন্যে, ভোস্টক-৬-এ ভ্যালেন্টিনা টেরেস্কভা
- প্রথম চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা, লুনা-২
- প্রথম ছবি চাঁদের, লুনা-৩
- প্রথম মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা, মার্স-৩
- প্রথম স্পেস স্টেশন, স্যালউট-১ (১৯৭১ সাল)
- প্রথম নারী মহাশূন্যে হেঁটেছে, সেটলানা স্যাভিটস্কায়া (১৯৮৪ সাল)
- প্রথম নভোচারী যিনি ১ বৎসরের বেশি মহাশূন্যে ছিলেন, ভি. টিটভ এবং মানারভ।
- প্রথম স্থায়ীভাবে মানুষ বসবাসকারী স্পেস স্টেশন, মির। ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষপথে ছিল।

টাইম ট্রাভেল করা কি সম্ভব?

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'টাইম মেশিন' বইতে দেখা যায় যে, একজন লোক বিশেষ ধরনের একটি চেয়ারে চেপে বসলো, তারপর সেখান থেকে কয়েকটা ডায়াল করা হলো, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে কয়েক হাজার বছর পরের পৃথিবীতে চলে গেল। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, বর্তমান ইংল্যান্ড আর নেই; সেখানে নতুন ধরনের বসতি গড়েছে, একটি প্রজাতির নাম 'মরলকস' আর অপরটির নাম 'ইলয়'।

এটা হয়তো গল্প হিসেবে দেখতে খুব মজা লাগছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা কি বিষয়টি সমর্থন করে? মানুষ কি আসলেই সময়ের সাপেক্ষে ভ্রমণ করতে পারবে? মানুষ কি তার ইচ্ছে মতো অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যেতে পারবে? তবে পদার্থবিদ্যার থিউরি নিয়ে কাজ করেন, তারা মনে করছেন 'কোয়ান্টাম গ্রাভিটি'র যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে, তাতে বিষয়টি সম্ভবও হতে পারে।

তবে এই ধরণের আলোচনায় বেশ কিছু প্যারাডক্স সবসময়ই চলে আসে। তার একটি হলো, পিতামাতাহীন একজন মানুষ। কেউ যদি অতীতে গিয়ে তার জন্মের আগেই তার পিতা-মাতাকে মেরে ফেলে, তাহলে কী হবে? কারো জন্মের আগেই যদি তার পিতামাতা মারা যায়, তাহলে সেই মানুষটি জন্ম নিয়ে অতীতে গিয়ে তার মা-বাবাকে মারতে যাবে কিভাবে?

আরো একটি প্যারাডক্স হলো, অতীতহীন একজন মানুষ। যেমন, ধরা যাক একজন যুবক বিজ্ঞানী একটি টাইম মেশিন বানানোর চেষ্টা করছে। তার গবেষণাগারে

BanglaInternet.com

হঠাৎ করেই একজন বুড়ো লোক এসে প্রবেশ করলো। এবং যুবকটিকে শিখিয়ে দিলো কিভাবে টাইম মেশিন বানানো যায়। এই যুবক বিজ্ঞানী টাইম মেশিন বানিয়ে প্রায়ই ভবিষ্যতে চলে যায় এবং সে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলা, স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করে প্রচুর অর্থ বানিয়ে ফেলে; কারণ সে ভবিষ্যত দেখতে পায়। তার পক্ষে সেটা সম্ভব। সে জানে কালকেই এই স্টকের মূল্য বেড়ে যাবে এবং সে ওই ষ্টক আগের দিন কিনে রাখে। এভাবে চলতে চলতে যখন সে বুড়ো হয়ে গেল, তখন তার অগাধ সম্পদ। তখন সে চিন্তা করলো, সে শেষবারের মতো একবার তার ছোটবেলায় ফিরে যাবে এবং তখন থেকে টাইম মেশিন বানানো শুরু করবে। এখন প্রশ্ন হলো, যখন এই মানুষটি ছোটবেলায় ফিরে যাবে, তখন তার স্মৃতিতে তো টাইম মেশিন বানানোর প্রক্রিয়াটি জানাই থাকবে না; কারণ সেটা সে শিখেছিল যুবক বয়সে।

বিষয়টি আরো জটিল করে ফেলা যায়। এবারে একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে হবে। এই প্যারাডক্সটির নাম হলো- একটি ছেলে যে নিজেই নিজের মা। এটা আবার কী করে সম্ভব তাই না?

এই গল্পটিও একটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনী থেকে নেয়া। স্বপ্না নামের একটি মেয়েকে কেউ একজন অনাথ আশ্রমে ফেলে গেছে। যখন স্বপ্না যুবতী হয়ে গেছে তখন সে একটি ছেলের প্রেমে পড়ে। এবং এক সময় মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যায়। স্বপ্না একটি শিশু কন্যার জন্ম দেয়। কিন্তু জন্ম দেয়ার পরমুহূর্তেই শিশুটি কিডন্যাপ হয়ে যায়। এদিকে স্বপ্নার জীবন খুব ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ডাক্তার দেখলেন যে, স্বপ্নার খুবই রক্তপাত হচ্ছে এবং যেকোনও সময় মারা যেতে পারে। ডাক্তার খেয়াল করলেন, আশ্চর্যজনকভাবে স্বপ্নার দুটো যৌনাঙ্গ রয়েছে। ডাক্তার তখন নারী স্বপ্নার জীবন বাঁচিয়ে তাকে পুরুষে রূপান্তরিত করে দিলেন এবং নাম রাখা হলো 'স্বপন'।

গল্প এখানেই শেষ নয়। স্বপন ধীরে ধীরে মদ খেতে শুরু করলো এবং প্রায়ই মদের দোকানে গিয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। মদের দোকানে যারা মদ পরিবেশন করে তাদেরকে বলে বারটেন্ডার। একদিন সে একজন বন্ধুসুলভ বারটেন্ডারের দেখা পেলো। আসলে এই বারটেন্ডার হলো একজন টাইম ট্রাভেলার, সে বারটেন্ডার সেজে এখানে কাজ করছে। এই বারটেন্ডার স্বপনের দুঃখ দেখে, তাকে অতীতে নিয়ে যায়। স্বপন অতীতে গিয়ে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে। এবং দুর্ঘটনাবশত মেয়েটিকে গর্ভবতী করে ফেলে। তার ভেতর এক ধরনের অনুশোচনা কাজ করে এবং শিশু কন্যাটিকে একটি অনাথ

যদি টাইম ট্রাভেল করা সম্ভব হয়, তাহলে ভবিষ্যতের কোন মানুষ অতীতে গিয়ে কি ইতিহাস পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে!

BanglaInternet.com

আশ্রমে ফেলে রেখে যায়। পরবর্তীতে স্বপন টাইম ট্রাভেলারদের দলে যোগ দেয় এবং ভিন্ন ধরণের জীবন যাপন করে। একসময় তার বয়স হয়। তারপর সে তার জীবনের শেষ স্বপ্ন হিসেবে অতীতের স্বপন নামের একজন মাতালের দেখা পাওয়ার জন্য বারটেন্ডার সেজে একটি মদের দোকানে কাজ নেয়। তাহলে এখানে স্বপ্নার মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, দাদী, নানা, নানী, নাতী ও নাতনী কে?

তবে সঙ্গত কারণেই সবসময় চিন্তা করা হয়েছে যে, সময়ের সাপেক্ষে ভ্রমণ করা অসম্ভব। নিউটন বিশ্বাস করতেন যে, সময় হলো একটি তীরের মতো; এটাকে একবার ছুঁড়ে দেয়া হলে এটা একটি সরল রেখায় চলতেই থাকে, কখনই এঁকে-বেকে যায় না। পৃথিবীতে যদি একটি সেকেন্ড পার হয়, তাহলে মঙ্গল গ্রহেও ঠিক একটি সেকেন্ড পার হয়। পুরো মহাশূন্যের জন্য একটিই ঘড়ি। সব জায়গায় একই সাথে একই হারে টিক টিক করে এগুচ্ছে।

কিন্তু আইনষ্টাইন সেটা মনে করতেন না। তিনি ভাবতেন, সময় হলো একটি প্রবাহমান নদীর মতো, যা বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির ভেতর দিয়ে বয়ে এসেছে; কখনও দ্রুত গতিতে, আবার কখনও বিশাল আকারের বস্তুর পাশে ধীর গতিতে। পৃথিবীতে একটি সেকেন্ড, মঙ্গল গ্রহে ঠিক একটি সেকেন্ড নয়। মহাবিশ্বে বিভিন্ন স্থানে সময় বিভিন্ন গতিতে চলছে। তারা তাদের নিজস্ব গতিতে ড্রাম পিটিয়ে যাচ্ছে। তবে আইনষ্টাইন তাঁর মৃত্যুর আগে একটি বিব্রতকর সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন। আমেরিকার প্রিন্সটনে আইনষ্টাইনের প্রতিবেশী ছিলেন কার্ট গডেল। তাকে বিগত ৫০০ বছরের মধ্যে সবচে বড় গাণিতিক যুক্তিবাদী হিসেবে ধরা হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে, আইনষ্টাইনের তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, তাহলে তা দিয়ে মানুষ সময়ের সাপেক্ষে ভ্রমণ করতে পারবে। সময়ের নদী ধরে কেউ যদি চলতে থাকে, তাহলে একসময় হয়তো তিনি নিজেকে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেই বিন্দুতে ফিরে আসবেন। তার অর্থ হলো, তিনি অতীতে ফিরে গেছেন।

চিরতরে আমেরিকায় চলে আসার পরপরেই নিজের পাসপোর্ট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন

আইনষ্টাইন তার জীবনীতে লিখে গিয়েছিলেন যে, তিনি এটা জানতে পেরে

BanglaInternet.com

খুবই বিব্রত যে তার ইকুয়েশনের এমন একটি সমাধান রয়েছে যা দিয়ে টাইম ট্রাভেল করা যায়। তবে তিনি সবশেষে বলে যান যে, এই মহাবিশ্ব আসলে ঘুরে না, এটা কেবল ছড়িয়ে যেতে থাকে (বিগ ব্যাং তত্ত্ব)। ফলে গডলের সমাধানটি এখানে কাজে লাগবে না।

তবে সম্প্রতি মাধ্যাকর্ষণের উপর কোয়ান্টাম থিউরির নতুন কিছু আবিষ্কার অনেকগুলো প্যারাডক্সের ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছে। কোয়ান্টাম থিউরি মতে, একটি বস্তু একই সাথে একাধিক অবস্থানে থাকতে পারে। যেমন একটি ইলেক্ট্রন একই সাথে বিভিন্ন কক্ষপথে থাকতে পারে। একইভাবে একটি বিড়াল একই সাথে দুটো সম্ভাব্য অবস্থানে থাকতে পারে - মৃত ও জীবিত। ফলে সময়ের সাপেক্ষে অতীতে গিয়ে কেউ যদি ঘটনা পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে হয়তো সমান্তরাল আরেকটি ঘটনাপ্রবাহ তৈরী হবে। কেউ যদি অতীতে গিয়ে শেখ মুজিবকে খুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে ফেলতে পারে, তবুও আমাদের কাছে তিনি এখন মৃতই থাকবেন। এবং এক্ষেত্রে সময়ের দুটো নদী তৈরী হবে। কিন্তু তার অর্থ কি এই যে, আমরা একটি চেয়ারে বসে সময়ের বিভিন্ন বিন্দুতে ভ্রমণ করতে পারবো?

না, অন্তত এই মুহূর্তে নয়। এখানে অতিক্রম করার মতো বেশ কিছু কঠিন বিষয় রয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো, এনার্জি বা শক্তি। গাড়ি চালাতে যেমন তেলের প্রয়োজন হয়, রকেট চালাতে আরো ভালো গ্যাসের প্রয়োজন হয়, এই টাইম মেশিন চালানোর জন্যও তো কোনও না কোনও এনার্জি বা শক্তির প্রয়োজন হবে। এবং নিঃসন্দেহে সেই এনার্জি হবে খুবই শক্তিশালী। এবং এই শক্তি আসবে কোথা থেকে? অন্তত আগামী কয়েক শতকে তো তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। আরো একটি বিষয় হলো, স্টাবিলিটি বা টিকে থাকা। যখন কেউ সময়ের পথে ভ্রমণ করবে, সেটা পুরো সিস্টেমটি একইভাবে টিকে থাকবে কি না? এটা সমাধান করার জন্য আমাদের সময়ের গণিতজ্ঞরা এখনও এতটা জ্ঞানী হয়ে ওঠেননি।

মজার ব্যাপার হলো, ষ্টিফেন হকিং এক সময় টাইম ট্রাভেলের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি টাইম ট্রাভেল থাকতো, তাহলে আমরা বর্তমান কিছু কিছু মানুষকে পেতাম যারা ভবিষ্যৎ থেকে আমাদের বর্তমানে ভ্রমণ করে আমাদেরকে দেখতে আসতো। আমরা ভবিষ্যতে বসবাস করে এমন কিছু পর্যটক এখন দেখতে পেতাম। কিন্তু আমরা তেমন কোনও পর্যটক দেখতে পাচ্ছি না। ফলে টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিকভাবে এতো বেশি পরিমাণে কাজ হয়েছে যে, তিনি এখন তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এখন মনে করেন যে, টাইম ট্রাভেল সম্ভব। উপরন্তু, আমরা হয়তো ভবিষ্যতের সেই পর্যটকদের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী নই।

এই মুহূর্তে শুধু একটা কথাই বলা যায়, তোমাদের কারো দরজায় এসে টোকা মেরে কেউ যদি বলে, আমি হলাম তোমার মেয়ের ঘরের বড় ছেলের ছোট মেয়ের নাতীর নাতনী, তাহলে তাকে তাড়িয়ে দিও না। এমনও হতে পারে, সে হয়তো ঠিক কথাটিই বলছে।

Banglainternet.com

স্পেস ওয়াক কী?

এটার শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় মহাশূন্যে হাঁটাহাটি করা। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে এই শব্দটি একটি বিভ্রান্তিকর; কারণ নভোচারীরা মহাশূন্যে ভেসে বেড়ান। তবে স্পেস-ওয়াক শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুঝানো হয় 'এক্সট্রা-ভিহাইকুলার এক্টিভিটি' (ই.ভি.এ বা সংক্ষেপে ইভা) বুঝানোর জন্য। একজন নভোচারী পৃথিবীর এবং তার নভোযানের বাইরে যে পরিমাণ কাজ করেন সেটাই হলো 'ইভা'। একটি নভোযানের বাইরে যখন একজন নভোচারীকে কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রেই ইভা শব্দটি সবচে বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে চাঁদে হাঁটাহাটি করাটাও (মুন-ওয়াক) ইভার অন্তর্ভুক্ত।

তবে আমেরিকার ও সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা ইভাকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একজন নভোচারী মহাশূন্যে কাজ করলেই তাকে ইভা বলে থাকেন। কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইভা হতে হলে নভোচারীকে অবশ্যই নভোযানের বাইরে এসে কাজ করতে হবে; মাথাটি হলেও তাকে বাইরে বের করতে হবে।

একটু কল্পনা করা যাক যে, একটি নভোযান পৃথিবী থেকে ২০০ মাইল দূরে প্রদক্ষিণ করছে। সেই নভোযানের গতি হবে ১৮,০০০ মাইল/ঘন্টা। নভোযানের ভেতরের যাত্রীরা পুরোপুরি ওজনহীন। মূলত নভোযানের ভেতরে কিংবা বাইরে সর্বত্রই তাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে নভোযানের ভেতরে কাজ করার সময় নভোচারীরা সিট-বেল্ট বেঁধে নেন, যেন তাঁরা তাঁদের শরীরকে ঠিক রেখে কাজ করতে পারেন। নইলে দেখা যাবে, একটা স্ক্রু লাগাতে গিয়ে তাঁরা নিজেরাই স্ক্রু-ড্রাইভারের সাথে ঘুরছেন।

যে নভোচারী নিজেকে স্পেস-ওয়াকের জন্য তৈরী করছেন, তাঁকে অবশ্যই বিশেষ ধরনের চাপ নিয়ন্ত্রক পোষাক পরতে হবে; কারণ ২০০ মাইল উপরে বাতাসের কোনও চাপ নেই। পাশাপাশি নভোচারীকে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর জন্য অক্সিজেন নিতে হবে। নভোচারীরা যখন নভোযানের বাইরে চলে যান, তখন নভোযানের সাথে যোগাযোগ রাখেন 'আমবিলিক্যাল হোস'-এর মাধ্যমে। এই হোস বা নল দিয়ে নভোচারীকে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকান নভোচারী এড হোয়াইট যখন জেমিনি নভোযানের বাইরে গিয়ে কাজ করেন, তখন এই পন্থা কাজে লাগানো হয়। ওই নলের সাথে অবশ্য রেডিও যোগাযোগের তার ও ছিল। সেই তারের মাধ্যমে তিনি নভোযানের ভেতরে অবস্থিত জিম ম্যাকডিভিটের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।

স্টিভ রবিনসন - ইভা করছেন

Banglainternet.com

তবে সর্বপ্রথম ইভা বা স্পেস-ওয়াক করেন সোভিয়েট নভোচারী আলেকসেই লিওনভ ১৮ মার্চ ১৯৬৫ ভস্কহড-২ নভোযান থেকে। তিনি তখন সাইবেরিয়ার উপরে ছিলেন।

প্রথম নারী যিনি সর্বপ্রথম ইভা করেন তিনিও রাশিয়ার ভেটলানা সাভিটকায়া (সয়ুজ-১২ মিশন ১৯৮৪ সাল)। তিনি অবশ্য মহাশূন্যের দ্বিতীয় নারী। ১৯৮২ সালে সয়ুজ-৭ মিশনে তিনি নভোচারী ছিলেন। ড. ক্যাথেরিন সুলিভান হলেন প্রথম আমেরিকান নারী যিনি মহাশূন্যে ইভা করেছিলেন ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে।

অনেকগুলো কারণে ইভা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ। মানুষ মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে অনেক বস্তু রেখে আসে যেগুলো কোনও কাজে লাগে না। এগুলোকে বলে স্পেস জাঙ্ক বা স্পেস ডেবরিস বা অরবিটাল ডেবরিস। বিশেষ করে রকেট ও স্যাটেলাইট থেকে অনেক কিছুই কক্ষপথে থেকে যেতে পারে। যেমন জেমিনি-১০ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল একটি ময়লা ফেলার থলি, একটি ক্যামেরা, এমনকি টুথ-ব্রাশ। তবে মহাশূন্যে কখনও বিস্ফোরণ হলে সবচে বেশি আবর্জনার তৈরী হয়। এই আবর্জনা বা স্পেস ডেবরিস বর্তমান সময়ে সবচে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ ইভার সময় এগুলোর সাথে নভোচারীর সংঘর্ষ হতে পারে। পৃথিবী থেকে ৩০০ কিলোমিটার উপরে কক্ষপথে সাধারণ গতি হলো ৭.৭ কিমি/সেকেন্ড। এই গতি একটি বুলেটের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি। ফলে একটি বুলেটের চেয়ে ১/১০০ ভাগ ছোট একটি বস্তুও (যেমন বালুকণা কিংবা উঠে যাওয়া একটু রঙ) বুলেটের সমান কার্যকর হবে। এর গতিশক্তি হবে বুলেটের সমান। প্রতিটি মিশনেই কিছু না কিছু আবর্জনা রেখে আসা হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত বিষয়টি আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। দেখা গেছে, ১ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় বস্তুকণা এখন পর্যন্ত ৬০০,০০০ বেশি কক্ষপথে রয়েছে।

আরো একটি ঝুঁকির কারণ হলো ওখানকার আবহাওয়া। নভোযানের বাইরের আবহাওয়া আগে থেকে অনুমান করা যায় না। তাই স্পেস-ওয়াক সবসময় এড়িয়ে চলা হয়। তাছাড়া যে মানুষটি মহাশূন্যে এভাবে নভোযানের বাইরে কাজ করতে যাবেন, তার মানসিক চাপও প্রচুর থাকে। তার স্নায়ু বৈকল্য হতে পারে।

আরো একটি বিপদ হলো, স্পেস-ওয়াকের সময় তিনি মূল নভোযান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। কিংবা তাঁর পোষাকটি ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। তখন তাঁর পোষাক থেকে চাপ বেরিয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে খুব দ্রুত তাঁকে নভোযানের ভেতর আনা না গেলে, নিশ্চিত মৃত্যু। এমন যে হয়নি, তা কিন্তু নয়। আমেরিকার নভোযান এসটিএস-৩৭-এর একজন নভোচারীর পোষাক একটি লোহার রড ছিদ্র করে ফেলেছিল। সেই নভোচারীর নাম প্রকাশ করা হয়নি (তবে জেরি রস কিংবা জে আপ্ট হবেন)। তবে ছিদ্রটি হয়েছিল হাতের কাছে। ফলে পুরো চাপ বেরিয়ে যায়নি। এমনকি ওটা যে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল তা টের পান নভোযানে ফিরে এসে। তাই সেই নভোচারী প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

তবে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ইভা করতে গিয়ে কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে বর্তমানে এই ধরনের কাজের জন্য রোবট তৈরী করা হচ্ছে যা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ফলে মানুষকে আর ইভা করতে হবে না।

BanglaInternet.com

মির (রাশিয়ার শান্তি) কী?

মির হলো রাশিয়ার স্পেস ষ্টেশন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে প্রথম মহাশূন্যে পাঠানো হয়। এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ওখানে রাখা হয়। ২৩ মার্চ ২০০১ সালে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নামিয়ে এনে প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়। তার জীবদ্দশায় মির ৩ বিলিয়ন কিলোমিটারের বেশি পথ পরিভ্রমণ করে এবং ১০৪ জন নভোচারীর বসতি ছিল।

পৃথিবীর প্রথম মডিউলার স্পেস ষ্টেশন মিরের ওজন ছিল ১৩৫ টন, যার ভেতর মূল অংশটির ওজন ছিল ২০.৯ টন। এর ছিল চারটি অংশ - কাজের জায়গা, থাকার জায়গা, ইঞ্জিন এবং ডকিং ষ্টেশন। ৯০ দশকের শুরুর দিকে মিরে ছয়টি মডিউল বাড়ানো হয়েছিল। ২৭ জুন ১৯৯৫ সালে স্পেস শাটল আটলান্টিস ওখানে ডক করেছিল; এবং ক্রু সদস্যদের বিনিময় করেছিল। মিরে একটি ছোট গমের দানা থেকে গাছ তৈরী করা হয়েছিল, যা ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ফলন দেয়। এটাই ছিল মহাশূন্যে প্রথম জন্মানো শস্য দানা।

কক্ষপথে থাকাকালীন সময়ে মির ১৫০০ বেশি সমস্যায় পতিত হয়েছিল। এমনকি ১৯৯৭ সালে মিরে আগুন ধরে গিয়েছিল। কিন্তু এর ক্রুরা সব কিছুই সামলে নিয়েছিলেন। তবে সবচে মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯৭ সালের জুন মাসে, যখন একটি মানুষহীন কার্গো জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগেছিল। এর ফলে মিরের সোলার প্যানেল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং সাময়িকভাবে একটি মডিউল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

এই ষ্টেশনে ছিলেন ১৪ মাস স্পেসে থাকার রেকর্ড সৃষ্টিকারী নভোচারী ভ্যালেরি পলিয়াকভ, যিনি ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৯৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মিরে অবস্থান করেন। ওখানে আরো গিয়েছিলেন, ১৯৯১ সালের মে মাসে মহাশূন্যে প্রথম বৃটিশ নাগরিক 'হেলেন শারমেন' এবং ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে প্রথম জাপানিজ সাংবাদিক ও মহাশূন্যে প্রথম যাত্রী টয়োহিরো আকিয়ামা।

চাঁদে প্রথম কে গলফের বলে আঘাত করেন?

এপোলো-১৪-এর নেতা নভোচারী এলান শেপার্ড চাঁদে সর্বপ্রথম গলফ বলে আঘাত করেন। তিনি চাঁদের মাটিতে একটি বল ছুঁড়ে মারেন; তারপর তাঁর গলফ স্টিক দিয়ে সেটাকে আঘাত করেন। প্রথম বার তিনি ব্যর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয় বার তিনি সফল হন। তিনি পৃথিবীতে এসে জানান যে, বলটি মাইলের পর মাইল চলতে থাকে।

মানুষবাহী কোন নভোযান দীর্ঘতম সময় স্পেসে থাকে?

ড. ভালেরিজ পলিয়াকভ একটি নভোযান নিয়ে জানুয়ারি ৮, ১৯৯৪ সালে স্পেস ষ্টেশন 'মির'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তিনি মার্চ ২২, ১৯৯৫ সালে সয়ুজ টিএম-২০ করে ফিরে আসেন। তিনি মোট ৪৩৮ দিন ১৮ ঘন্টা মহাশূন্যে ছিলেন।

Banglainternet.com

কোন বিবাহিত যুগল একসাথে প্রথম মহাশূন্যে যান?

নভোচারী জ্যান ডেভিস এবং মার্ক লি হলেন মহাশূন্যে প্রথম বিবাহিত যুগল। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সালে তারা স্পেস শাটল এনডেভর-এ করে আট দিনের এক সফরে মহাশূন্যে যান। সাধারণত নাসা বিবাহিত যুগলদেরকে একসাথে মহাশূন্য যেতে অনুমতি দেয় না। ডেভিস ও লি-র জন্য ব্যতিক্রম হয়েছিল, কারণ তাদের তখন কোনও সন্তান ছিল না এবং তাদের বিয়ের অনেক আগেই মহাশূন্যে যাওয়ার ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল।

অন্যান্য গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?

বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার সম্ভাবনা বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফ্রাঙ্ক ড্রাক (জন্ম ১৯৩০ সাল) নামের একজন আমেরিকার জ্যোতির্বিদ একটি সূত্র আবিষ্কার করেন, যার মাধ্যমে এই সম্ভবনাটি মাপা যেতে পারে। সূত্রটি নিম্নরূপ -

$$N = N^* f_p n_e f_l f_c f_L$$

অর্থ্যাৎ, অগ্রসর সভ্যতার সংখ্যা (N) হলো-

N^* = মিল্কি-ওয়ে গ্যালাক্সিতে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা

f_p = সেই তারাগুলোর ভেতর যাদের গ্রহ আছে তাদের সংখ্যা

n_e = যে সকল গ্রহ জীবন ধারণের জন্য সক্ষম তাদের সংখ্যা

f_l = জীবন ধারণ করতে পারে এমন সংখ্যক গ্রহ যেখানে জীবন শুরু হয়েছে

f_c = প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর সভ্যতা তৈরী হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা

f_L = প্রযুক্তিগত সেই সভ্যতা যতটা সময় ধরে টিকে আছে বা ছিল

কেউ কি এক্সট্রাটেরিষ্ট্রিয়াল জীবনের সন্ধান করছে?

ভিন গ্রহে প্রাণের সন্ধানের জন্য একটি কার্যক্রম রয়েছে যার নাম হলো 'সেটি' (দি সার্চ ফর এক্সট্রাটেরিষ্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স)। ১৯৬০ সাল থেকে এই কার্যক্রম চালু আছে। সেই সময়ে ফ্রাঙ্ক ড্রাক নিকটবর্তী কোনও নক্ষত্র হতে কোনও রেডিও সিগনাল পাওয়া যায় কি না তা পরীক্ষা করার জন্য আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে তিন মাস সময় কাটান। যদিও তেমন কিছু ফলাফল পাওয়া যায়নি, তবুও তখন থেকেই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধানের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

সেন্টিনেল নামে একটি প্রজেক্ট পরিচালনা করা হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে যে রেডিও ডিশ বসানো হয় তা দিয়ে একসাথে ১২৮,০০০টি চ্যানেল দেখা যেতো।

BanglaInternet.com

১৯৮৫ সালে এই প্রজেক্টের ক্ষমতা বাড়ানো হয়, যার নাম মেটা (মেগাচ্যানেল এক্সট্রাটেরিষ্ট্রিয়াল অ্যাসে)। এই প্রজেক্টের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ষ্টিভেন স্পিলবার্গ আংশিক টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছিলেন। 'মেটা' একসাথে ৮.৪ মিলিয়ন চ্যানেল ধরতে সক্ষম। ১৯৯২ সাল থেকে নাসাও রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জীবনের সন্ধান করতে শুরু করে।

রকেট কী?

অতি দ্রুত পুড়ে যাওয়া জ্বালানী থেকে তৈরী গ্যাসের বিক্রিয়ার ফলে পরিচালিত দূরপাল্লার যানকে বলে রকেট। যদিও জেট ইঞ্জিনগুলোও গ্যাসের বিক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত, তবুও ওগুলো রকেট নয়। আগুন ধরানোর জন্য রকেট নিজেই অক্সিজেন বহন করে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ামণ্ডলের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময় রকেটের মাথায় বোমা লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে অনেক দূরে বসেও শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করা যায়। তাই রকেটকে অনেক দিন যাবৎ যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে দেখা হতো।

কিন্তু পরবর্তীতে এর ব্যবহার ও রকেটের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। কারণ রকেট অনেক উঁচুতে উড়ে যেতে পারে, এবং সাথে করে অন্যান্য ভারী বস্তুকে বহন করে নিতে পারে। এটি প্রপালশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বলে শূন্যস্থানেও চলাচল করতে পারে। এবং মহাশূন্যে যাওয়ার জন্য সবচে ভালো মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। তারপর তৈরী হয়েছে অনেকগুলো রকেট জোড়া দিয়ে একটি রকেট বানানোর কৌশল। একে বলে মাল্টিস্টেজ রকেট। মহাকাশের বিভিন্ন স্তরে রকেটের বিভিন্ন অংশ কাজ করে থাকে।

প্রধানত দুই ধরনের রকেট ব্যবহার করা হয়ে থাকে - প্রথমটি ব্যবহার করে তরল প্রপাল্যান্ট; আর দ্বিতীয়টি ব্যবহার করে কঠিন প্রপাল্যান্ট। যুদ্ধে ব্যবহার্য রকেট কঠিন প্রপাল্যান্ট হিসেবে গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে সকল রকেট মহাশূন্যে যায়, সেগুলো সিন্থেটিক রাবার বাইন্ডারের সাথে এলুমিনিয়ামের গুড়া মিশানো হয় জ্বালানী হিসেবে। তবে বেশিরভাগ রকেটই তরল প্রপাল্যান্ট ব্যবহার করে থাকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে খুব শক্তিশালী এবং নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। তরল হাইড্রোজেন ও কেরোসিন হলো প্রচলিত সাধারণ জ্বালানী। তবে অক্সিজেনের সরবরাহ করার জন্য তরল অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এখন পর্যন্ত সবচে বৃহৎ যে রকেটটি তৈরী করা হয়েছে তার নাম হলো 'স্যাটার্ন ফাইভ মুন' রকেট (http://www.apollosaturn.com). এপোলো প্রজেক্টের জন্য এই রকেটটি তৈরী করেন জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকার রকেট বিজ্ঞানী ওয়ার্নার ভন ব্রাউন। এটা ছিল তিন স্তরের রকেট এবং ১১১ মিটার উঁচু। উড্ডয়নের সময় এর ওজন ছিল ২৭০০ টনের বেশি, যা পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ১৪০ টন ওজন বহন করে নিয়ে যেতে পারতো। এটাই এপোলো স্পেসক্রাফটকে পৃথিবীর কক্ষপথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তবে ১৯৯০ দশকের সবচে' ক্ষমতাশালী রকেটটি বানিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়া, যার নাম এনার্জিয়া। এটি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ১৯০ মেট্রিক টন ওজন টেনে

BanglaInternet.com

নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আমেরিকার তৈরী রকেটগুলো সর্বোচ্চ মাত্র ২৯ মেট্রিক টন ওজন (যেমন যন্ত্রপাতি) মহাশূন্যে নিয়ে যেতে পারে।

তবে রকেট সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে, কবে কোন রকেট উড়ে যাবে, রকেট ক্লাব ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যের জন্য ইন্টারনেটের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এমন একটি ওয়েব সাইট হলো - http://www.rocketryonline.com

টেলষ্টার কী?

এটি হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আমেরিকার তৈরী স্যাটেলাইট। ১০ জুলাই ১৯৬২ সালে এটিকে কক্ষপথে ছাড়া হয় এবং সর্বপ্রথম আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে সরাসরি টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। টেলষ্টার প্রতি ২.৬৩ ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

উড়ন্ত সসার কোথায় দেখা গেছে?

১৯৪৭ সালে এই শব্দটি (ফ্লায়িং সসার) পৃথিবীর মানুষের কাছে আসে। কিন্তু এর জন্ম হয় ইউ.এফ.ও (আন-আইডেন্টিফাইড ফ্লায়িং অবজেক্ট) থেকে। আকাশে অনেক উড়ন্ত বস্তু বা আলো দেখা যায় যেগুলোকে তখুনি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অনেকেই দাবী করেন এগুলো আসলে ভিন গ্রহের প্রাণীদের পাঠানো স্পেসক্রাফট। কিন্তু এর পেছনে শক্ত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ওই উড়ন্ত বস্তুগুলোকে কোনও না কোনও পরিচিত বস্তুর সাথে মেলানো গেছে। অনেক সময় ওগুলো হয়তো উজ্জ্বল নক্ষত্র কিংবা গ্রহ, মেটিওর, উড়োজাহাজ এবং স্যাটেলাইট নয়তো কারো বানানো গল্প। তখন থেকেই শুরু উড়ন্ত সসারের গল্প।

১৯৬৮ সালে আমেরিকার বিমান বাহিনী ইউএফও-র উপর একটি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে। এবং একটি পরিসমাপ্তিতে আসে যে, এই উড়ন্ত বস্তুগুলোর সাথে ভিন গ্রহের (এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল) কোনও সম্পর্ক নেই। আবার পাশাপাশি পুরো পৃথিবীতে বিভিন্নস্থানে হাজার হাজার মানুষ দাবী করছে তারা উড়ন্ত সসারের মতো কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। তারা বিশ্বাস করতে চান যে, ওগুলো ভিনগ্রহ থেকে এসেছে। এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা যাকে ভিনগ্রহের উড়ন্ত বাহন বলছেন সেগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞান কল্পকাহিনী বইতে আঁকা সিগারেট আকৃতি বা সসার আকৃতির বস্তু।

বৃটিশ ইউ.এফ.ও রিসার্চ অরগানাইজেশন (http://bufora.org.uk) এই ধরনের বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকে। কারো এই বিষয়ে আরো জানার আগ্রহ থাকলে এই প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে যাওয়া যেতে পারে।

Banglainternet.com

মহাবিশ্বের মানুষ

Banglainternet.com

মহাবিশ্বের মানুষ

হাবল কে?

এডউইন পাওয়েল হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) ছিলেন একজন আমেরিকার জোতির্বিদ যিনি বিভিন্ন গ্যালাক্সির উপর গবেষণার জন্য বিখ্যাত। হাবল বিভিন্ন গ্যালাক্সিকে তাদের আকৃতির উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিন্যাস করেন; যেমন, স্পাইরাল, ইলিপটিকাল কিংবা ইরেগুলার। তিনি নেবুলা নিয়েও গবেষণা করেন।

হাবলের নামে একটি সূত্র রয়েছে যার নাম 'হাবলের সূত্র'। সেই সূত্রানুসারে, গ্যালাক্সি যে হারে সরে যাচ্ছে, তার সাথে দূরত্বের একটি সম্পর্ক আছে। যে গতিতে গ্যালাক্সি সৌরজগত থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা, সৌরজগত থেকে তার দূরত্বের সমানুপাতিক।

হাবল

ছোটবেলা থেকেই হাবলের বিজ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি যেমন খুব তুঁখোড় ছাত্র ছিলেন, তেমনি ছিলেন খেলাধুলায় পারদর্শী। তিনি ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত ও জোতির্বিদ্যার উপর স্নাতক ডিগ্রি নেন। তারপর তিনি রোডস বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে যান। সেখানে তিনি জোতির্বিদ্যা পড়া ছেড়ে দিয়ে আইন বিষয়ে পড়তে শুরু করেন। এবং সেই সময়ে তিনি চিন্তা করেননি যে, তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে তার ক্যারিয়ার করবেন। ১৯১৩ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় ফিরে এসে ক্যানটাকি রাজ্যে আইন ব্যবসায় জড়িত হন। কিন্তু তিনি আইন ব্যবসা মোটেও উপভোগ করছিলেন না। তিনি বুঝতে পারেন, তার যাবতীয় আগ্রহ হলো জোতির্বিদ্যায়। তাই ১৯১৭ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোতির্বিদ্যার উপর ডক্টরেট ডিগ্রি নেন।

১৯১৭ সালে আলবার্ট আইনষ্টাইন তার বিখ্যাত রিলেটিভিটি তত্ত্বের মাধ্যমে মহাশূন্যের একটি মডেল ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু হাবল সেই ব্যাখ্যায় ভুল বের করেন। ধন্যবাদ দেয়ার জন্য ১৯৩১ সালে আইনষ্টাইন হাবলকে দেখতে আসেন।

BanglaInternet.com

হাবল আবিষ্কার করেন যে, আমাদের গ্যালাক্সি ছাড়াও মহাবিশ্বে আরো অনেক গ্যালাক্সি রয়েছে। আবার তিনি যখন দেখতে পান যে, মহাবিশ্ব ক্রমশ বাইরের দিকে বেড়েই চলেছে, তাহলে নিশ্চয়ই কোনও একটি বিন্দু থেকে তারা তাদের যাত্রা শুরু করেছিল। এবং সেই বিন্দু থেকে বাইরের দিকে ছুটে চলার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। তার এই চিন্তা থেকেই বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম নেয়।

১৯৯০ সালের ২৫ এপ্রিল, 'ডিসকোভারি' মহাশূন্যে একটি টেলিস্কোপ স্থাপন করে, যার নাম রাখা হয় **হাবল স্পেস টেলিস্কোপ**। যেহেতু এটি মহাশূন্যে স্থাপন করা হয়েছে তাই এটি পৃথিবীর জলবায়ু দ্বারা নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এটাকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে সবকিছু আরো কাছ থেকে দেখার জন্য এবং পৃথিবীতে স্থাপিত যেকোনও টেলিস্কোপের চেয়ে আরো ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য। তবে ১৯৯০ সালের জুন মাসেই নাসা বলে যে, ওই টেলিস্কোপটির একটি কাচে ত্রুটি আছে। ফলে এটা দিয়ে সঠিকভাবে ফোকাস করা যেতো না। কিন্তু অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতি ঠিক মতো কাজ করতো। এটা এমনকি আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতেও কাজ করতো। তবে ১৯৯৩ সালের ২ ডিসেম্বর, নভোচারীরা এই ত্রুটি ঠিক করতে সমর্থ হন।

ষ্টিফেন হকিং এতো বিখ্যাত কেন?

ষ্টিফেন উইলিয়াম হকিং (জন্ম ৮ জানুয়ারি ১৯৪২) হলেন একজন বৃটিশ পদার্থবিদ ও গণিতবিদ। বিংশ শতাব্দীর সবচে মহৎ বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁকে দেখা হয়। গ্যালিলিও-এর মৃত্যুর ৩০০ বছর পর ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে তার জন্ম। যদিও তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ষ্টিফেন ডাক্তারী-বিদ্যা পড়বেন, কিন্তু তিনি পড়তে চান গণিত। কিন্তু সেই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গণিত বিষয়টি ছিল না, তাই ষ্টিফেন পদার্থবিদ্যা বেছে নেন।

ওই সময়ে অক্সফোর্ডে কেউ কসমোলজি পড়তো না বলে তিনি ক্যামব্রিজে পড়তে যান। সেখানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি প্রথম রিসার্চ ফেলো হিসেবে গনভিল কলেজে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে তিনি এস্ট্রোনমি ইনিষ্টিটিউট ছেড়ে দিয়ে ফলিত গণিত বিভাগে যোগ দেন। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি 'লুইকা-সিয়ান প্রফেসর অফ ম্যাথামেটিক্স' পদটি দখল করে আছেন। হ্যানরি লুকাসের রেখে যাওয়া সম্পত্তির টাকা দিয়ে এই পদটি ১৬৬৩ সালে তৈরী করা হয়। এই পদটি প্রথম অধিকার করেন আইজাক ব্যারো এবং পরবর্তীতে ১৬৬৯ সালে আইজাক নিউটন।

শারীরিকভাবে তিনি পঙ্গু। ব্ল্যাক হোল তত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা অনেক অবদান রাখে। তবে তিনি মূলত স্পেস ও সময়ের প্রকৃতি এবং তাদের ভেতর যে অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। যেমন তিনি প্রস্তাব করেন যে, ব্ল্যাক হোল থেকে তাপ বিকিরণ হতে পারে; এবং ব্ল্যাক হোলের যাবতীয় ভর যদি বিকিরণে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাহলে ব্ল্যাক হোলটি আর থাকবে না। এটাকে অবশ্য 'হকিং রেডিয়েশন' বলে। বর্তমানে তিনি কোয়ান্টাম

BanglaInternet.com

স্টিফেন হকিং

ম্যাকানিক্স এবং রিলেটিভিটি তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম গ্রাভিটি তত্ত্বের জন্ম দেয়া যায় কি না, তা নিয়ে কাজ করছেন। তার অনেকগুলো জনপ্রিয় বই রয়েছে। তবে সবচে' জনপ্রিয় বইটি হলো 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম'।

টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন কে?

হ্যানস লিপারশে (১৫৭০-১৬১৯) ছিলেন একজন জার্মান-ডাচ লেন্স ও চশমা প্রস্তুতকারক। ১৬০৮ সালে তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন। তাঁকেই প্রথম

BanglaInternet.com

আবিষ্কারক হিসেবে ধরা হয়, কারণ তিনিই প্রথম টেলিস্কোপের প্যাটেন্ট দাবী করেন। আরো দুজন বিজ্ঞানী যারা টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন তাঁরা হলেন জাকারিয়া জেনসেন এবং জ্যাকব মেটিয়াস।

১৬০৯ সালে এস্ট্রোনমিকাল কাজে গবেষণার জন্য গ্যালিলিও তাঁর নিজের টেলিস্কোপ তৈরী করেন। গ্যালিলিও চাঁদের গায়ে গর্ত এবং মিল্কি-ওয়ে দেখার জন্য ওই টেলিস্কোপ ব্যবহার করতেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই কে ছিলেন?

গ্যালিলিও গ্যালিলেই

গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) ছিলেন একজন ইতালির বিজ্ঞানী। তিনি নিজেই একটি টেলিস্কোপ তৈরী করেছিলেন যা দিয়ে তিনি চাঁদের গর্ত এবং বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। তার বাবা ছিলেন একজন সঙ্গীত শিক্ষক। তিনি গ্যালিলিওকে ডাক্তারী-বিদ্যা পড়ার জন্য ইতালির পিসা শহরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু গ্যালিলিও ডাক্তারী-বিদ্যা পছন্দ করলেন না। তাঁর আগ্রহ ছিল গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শনশাস্ত্রে। তাই গ্যালিলিও গ্রীষ্মকালে পিসা থেকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন এবং গণিত নিয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৫৮২-৮৩ সালে গ্যালিলিও ইউক্লিডের সূত্র সম্পর্কে লেখাপড়া করেন। কিন্তু তাঁর বাবা এটা পছন্দ করছিলেন না। তাঁর স্বপ্ন ছিল ছেলে একদিন বিখ্যাত ডাক্তার হবে। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ইউক্লিড ও আর্কিমিডিস নিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। তখনও পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী-বিদ্যার ছাত্র হিসেবে তার নামটি ছিল। ফলে ১৫৮৫ সালে তিনি ডাক্তারী-বিদ্যা পড়ায় ইস্তফা দেন। ফলে তার আর ডিগ্রি নেয়া হলো না।

১৫৯১ সালে গ্যালিলিওর বাবা মারা যান। ফলে গ্যালিলিওকে তার পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। তাঁর দুটো ছোট বোন ছিল। তাদের বিয়ের যৌতুক দেয়ার সমর্থ তাঁর ছিল না। তখন গ্যালিলিও পিসাতে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। টাকার প্রয়োজনে তিনি সেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, যেখানে তিনি প্রায় তিনগুণ বেশি বেতন পেতেন। তিনি ১৮ বছর পাদুয়াতে কাটান এবং পরবর্তীতে আত্মজীবনীতে লিখেন যে, এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচে' সুখের সময়। তিনি পাদুয়াতে ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং জোতির্বিদ্যা পড়াতেন। ১৫৯৮ সালে তিনি কেপলারকে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি কুপারর্নিকাসের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন।

পাদুয়াতে তিনি মারিয়া গামবা নামের এক মহিলার সংস্পর্শে আসেন। তবে তাঁরা বিয়ে করেননি। মনে করা হয় যে, গ্যালিলিও তাঁর আর্থিক দৈন্যতার জন্য বিয়ে করতে

BanglaInternet.com

রাজী হননি। তবে ১৬০০ সালে তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তান ভার্জিনিয়ার জন্ম হয়। ঠিক পরের বছর তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা লিভিয়ার জন্ম হয়। ১৬০৬ সালে তাঁদের পুত্র সন্তান ভিনসেনজোর জন্ম হয়।

গ্যালিলিও জানতে পারেন যে, একজন ডাচ ক্রাফটম্যান এক ধরনের টেলিস্কোপ তৈরী করেছে। গ্যালিলিও তাঁর দক্ষতা দিয়ে এর চেয়ে ভালো টেলিস্কোপ তৈরী করেন। তাঁর প্রথম তৈরী টেলিস্কোপ দিয়ে কোনও বস্তুকে চারগুণ বড় দেখা যেতো। গ্যালিলিও শিখে ফেলেছিলেন কি করে লেন্স পলিশ করে আরো ক্ষমতা বাড়ানো যায়। ১৬০৯ সালে তিনি এমন একশটি টেলিস্কোপ তৈরী করেন যা দিয়ে ৮ থেকে ৯ গুণ বড় দেখা যেতো। গ্যালিলিও তখুনি তাঁর পণ্যের বাণিজ্যিক দিকটা দেখতে পান, বিশেষ করে সমুদ্রগামী জাহাজে। সেখানে টেলিস্কোপকে বলা হয় পার্সপিসিলাম। তিনি খুব উঁচু বেতনের আশায় টেলিস্কোপের যাবতীয় কপিরাইট একজন টেলিস্কোপ প্রস্তুতকারীকে দিয়ে দেন। এটা অবশ্য তাঁর জন্য ভালোই ছিল ; কারণ তিনি কখনই দাবি করেননি যে, তিনি টেলিস্কোপের উদ্ভাবক ছিলেন।

১৬০৯ সালের শেষের দিকে তিনি রাতের আকাশ দেখার জন্য টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে শুরু করেন। এবং বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কার করেন। তিনি দাবী করেন যে, তিনি চাঁদে পাহাড় দেখতে পেয়েছেন। তিনি ২৫ জুলাই ১৬১০ সালে প্রথম শনি গ্রহের দিকে তার টেলিস্কোপ তাঁক করেন। কিন্তু তাঁর টেলিস্কোপ খুব বেশি ক্ষমতাশালী না হওয়ার, তিনি শনির চারদিকে বৃত্ত দেখতে পাননি। যদিও গ্যালিলিও অনেক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন, তবে সব ক্ষেত্রে তিনি সঠিক ছিলেন না।

'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে' এটা বিশ্বাস করতেন বলে চার্চ শেষ জীবনে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখে। ১৬৩৪ সালে তাঁর মেয়ে ভার্জিনিয়া মারা গেলে তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়েন। গ্যালিলিও অনেক মাস কোনও কাজ করতে পারেননি। তারপর যখন পুনরায় কাজ করতে শুরু করেন, তখন তিনি রচনা করেন 'ডিসকারেজ'। এবং তাঁর এই কাজ গোপনে রোম থেকে চলে যায় হলান্ডে। সেখান থেকে ওটা প্রকাশিত হয়।

তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল পিতার কবরের পাশে সমাহিত হবার। কিন্তু তাঁর আত্মীয়রা তৎকালীন চার্চ ব্যবস্থাপনাকে ভয় পেত। ফলে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তবে ৩১ অক্টোবর ১৯৯২ সালে গ্যালিলিওর মৃত্যুর ৩৫০ বছর পর পোপ জন পল-২ ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে বলেন যে, গ্যালিলিওর বিচারের সময় ভুল করা হয়েছিল।

সিস্টেমেটিক এস্ট্রোনমির প্রতিষ্ঠাতা কে?

গ্রিক বিজ্ঞানী হাইপারশাস (১৪৬-১২৭ বি.সি.ই)-কে সিস্টেমেটিক এস্ট্রোনমির জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম তারাদের একটি ক্যাটালগ তৈরী করেন যেখানে ৮৫০টি তারার স্থান ছিল। এবং তিনি যথেষ্ট সঠিকভাবে আকাশে তারাদের নির্ণয় করেছিলেন। তারাদের উজ্জ্বলতা এবং আকার অনুযায়ী তিনি শ্রেণীবিভাগও করেছিলেন।

BanglaInternet.com

নিকোলাস কুপার্নিকাস

নিকোলাস কুপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) ছিলেন পোল্যান্ডের একজন বিখ্যাত জোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবী নিজের অক্ষ বরাবর প্রতিদিন ঘুরছে এবং বছরে একবার স্থির সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তাঁর এই তত্ত্বের উপর পরবর্তীতে অনেক কাজ হয়েছে এবং পরিবর্ধন ও পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন চার্চ ব্যবস্থপনা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

কুপার্নিকাস তাঁর মা-বাবার সবচে ছোট সন্তান ছিলেন। তাঁর বয়স যখন দশ তখন তাঁর বাবা মারা যান। তখন তাঁর চাচা তাঁদের দায়িত্ব নেন। তিনি ক্রাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন, গণিত, জোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, কুপার্নিকাস যখন জোতির্বিদ্যা পড়ছিলেন সেগুলো কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেখানে পড়ানো হতো এরিষ্টটল এবং টলেমী'র মতানুসারে দেখা জোতির্বিদ্যা। এর মূল কারণ ছিল, ছাত্রছাত্রীরা যেন ক্যালেন্ডার বুঝতে পারে, পবিত্র দিনগুলোর দিনক্ষণ বের করতে পারে, এবং যে নাবিক সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যাবে তারা যেন দিক সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। পাশাপাশি তাদেরকে মানুষের জন্মক্ষণ দেখে ভাগ্য গণনার পদ্ধতি শেখানো হতো। কিন্তু এদিকে তাঁর চাচা সবসময় চাইতেন যেন কুপার্নিকাস জোতির্বিদ্যা শিখে গির্জা ব্যবস্থাপনায় যোগ দান করে। কারণ তিনি নিজেও গির্জায় যোগদান করেছিলেন। সেই সময়ে মূলত গির্জাই ছিল সকল ক্ষমতার উৎস। সে জন্য তাঁর চাচা কুপার্নিকাসকে গির্জার আইন পড়ার জন্য বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। এবং এক সময় তিনি সত্যি সত্যি পাদ্রী হয়ে যান। তবে সেটা কেবলি চাকুরীর জন্য। পাশাপাশি তিনি তাঁর যাবতীয় গবেষণা কাজ চালিয়ে যান।

১৫১৪ সালে তিনি তাঁর কাছের বন্ধুদের মাঝে একটি ছোট বই বিতরণ করেন। বইটি ছাপানো নয়, হাতে লেখা। এবং সেখানে লেখকের নামও ছিল না। তবে তাঁর বন্ধুরা হাতের লেখা চিনতেন। ওই বইতেই তিনি মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেন যেখানে সূর্য হলো এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। সেই সময়ের চিন্তাবিদরা টলেমী'র তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, যেখানে বলা হয়েছে যে মহাবিশ্ব হলো একটি গোলাকার বদ্ধ জায়গা এবং তার বাইরে আর কিছু নেই। টলেমী আরো বলেন যে, পৃথিবী হলো একটি স্থির বস্তু যা মহাবিশ্বের কেন্দ্র এবং সূর্যসহ যাবতীয় নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে।

নিকোলাস কুপার্নিকাস

তবে কুপার্নিকাস তাঁর গবেষণার কাজ কখনই প্রকাশ করতে চাইতেন না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি গির্জা প্রশাসনকে ভয় পেতেন। তিনি আসলে একজন খুব খুঁতখুতে মানুষ ছিলেন। কোনও কাজ খুব সঠিকভাবে হলো কি না সেটা নিশ্চিত করতে চাইতেন। একই বিষয়ে তিনি ত্রিশ বছর কাজ করার পরও মনে করতেন যে, কাজটি হয়তো শেষ হয়নি।

Banglainternet.com

মজার ব্যাপার হলো, কুপার্নিকাসের নিজের হাতের লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট ৩০০ বছরের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল ; পরবর্তীতে ১৯ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রাগে সেগুলো পাওয়া যায়। সেই স্ক্রিপ্ট দেখলে বুঝা যায় তিনি কত বার সেখানে কাটাকাটি করেছেন।

জোহানেস ক্যাপলার

জোহানেস ক্যাপলার (১৫৭১-১৬৩০) হলেন জার্মানির একজন বিখ্যাত গণিতবিদ জোতির্বিদ ও রাশিফল জাতক এবং প্রথম দিককার বিখ্যাত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক। তিনি সবচে' বেশি পরিচিত হলেন তার বই 'ল অফ প্লানেটারি মোশন' এবং টেক্সট বই 'ইপিটমি অফ কুপার্নিকান এস্ট্রোনমি'।

ক্যাপলার চাকুরী জীবনে অষ্ট্রিয়ার গ্র্যাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক ছিলেন, মহারাজা রুডল্ফ-২-এর গণিতজ্ঞ মি. টাইকো ব্রাহের সহকারী ছিলেন, লিনজ-এ গণিতের শিক্ষক ছিলেন এবং জেনারেল ওয়ালেস্টেইনের রাজ-জোতিষী ছিলেন। তিনি আলোর উপর কিছু প্রাথমিক গবেষণাও করেন এবং গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ তৈরীতে সহায়তা দেন। তাঁকে বলা হয় প্রথম 'থিউরিটিক্যাল এস্ট্রোফিজিশিস্ট'; আবার তাঁকে ডাকা হয় 'লাস্ট সাইন্টিফিক এস্ট্রোলজার' হিসেবে।

তাঁকে ছোটবেলা থেকেই জোতির্বিদ্যা ও জোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছিল। তিনি পাঁচ বছর বয়সে ১৫৭৭ সালের ধূমকেতু দেখেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে, এটা দেখার জন্য তাঁর মা তাঁকে একটি উঁচু জায়গা নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার নয় বছর বয়সে তিনি আরেকটি চমৎকার বিষয় দেখার সুযোগ পান - ১৫৮০ সালের 'চন্দ্রগ্রহণ' (লুনার একলিপ্স)। তবে ছোটবেলায় তাঁর স্মলপক্স হওয়ার দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। ফলে তিনি জোতির্বিদ্যায় পর্যবেক্ষণ বাদ দিয়ে গণিতে মনোনিবেশ করেন। তাঁর লেখাপড়া শেষ হওয়ার শেষ পর্যায়ে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ১৫৯৪ সালে তাঁকে গ্র্যাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকুরীর জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। ১৫৯৯ সালে টাইকো ব্রাহে তার কাজে সহযোগিতার জন্য ক্যাপলারকে আমন্ত্রণ জানান। ১৬০০ সালে তিনি ব্রাহের সাথে কাজ শুরু করেন। এবং ১৬০১ সালে টাইকো মারা গেলে ক্যাপলার রাজ-গণিতবিদ হিসেবে নিয়োগ পান। এই কাজে তাঁকে রাজার রাশিফল দেখতে হতো।

জোহানেস ক্যাপলার

১৬০৪ সালে ক্যাপলার একটি সুপারনোভা দেখতে পান, যার নাম রাখা হয়েছিল ক্যাপলার স্টার। ১৬১২ সালে রাজা মারা গেলে তখন প্রাগে ধর্মীয় গোড়ামী বাড়তে থাকে। তিনি তখন লিনজে চলে যান। ক্যাপলার এমন একটা সময়ে জীবন যাপন করেন যখন মানুষ জোতির্বিদ্যা ও জোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে পার্থক্য করতে

BanglaInternet.com

পারতো না। ক্যাপলার বিশ্বাস করতেন যে, মহাবিশ্বের অনেক বস্তু দ্বারা পৃথিবীর অনেক কিছুই প্রভাবিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, চাঁদের কারণে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে এবং সেটা তিনি সঠিকভাবে নিরুপণ করেছিলেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, মহাবিশ্বের গ্রহ-উপগ্রহগুলোর প্রভাব আবহাওয়ার মতো মানুষের উপরও থাকবে। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, এমন একদিন আসবে যখন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নির্ভর করে জোতিষশাস্ত্র পরিচালিত হবে, যাকে বলা হয়ে থাকে সাইন্টিফিক এস্ট্রোলজি।

অস্ট্রিয়ার লিনজে বসে তিনি 'হারমনাইস মুন্ডি' লিখেছিলেন বলে ১৯৭৫ সালে 'কলেজ ফর সোসাল এন্ড ইকনোমিক সায়েন্স'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'জোহানেস ক্যাপলার বিশ্ববিদ্যালয় লিনজ'।

প্রাগে টাইকো ব্রাহে ও জোহানেস ক্যাপলারের মূর্তি

Banglainternet.com

স্যার আইজেক নিউটন

"Nature and Nature's Laws lay hid in night:
God said, 'Let Newton be!' — And all was light." (Pope.)

স্যার আইজেক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) ছিলেন একজন প্রিমেচিউর বেবি। জন্মের সময় তিনি এতই ছোট ছিলেন যে তাঁর মা প্রায়ই বলতেন, নিউটনকে একটি মগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখা যাবে। নিউটনের জন্মের কয়েক মাস আগেই তাঁর বাবার মৃত্যু হয় এবং তাঁর মা আরেকটি বিয়ে করেন। ফলে নিউটন তাঁর দাদীর কাছে বড় হন।

তাঁর লেখাপড়ার শুরুটা ছিল খুব খারাপ। তিনি তাঁর গ্রামার স্কুলের খারাপতম ছাত্রদের একজন ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। তিনি এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করেন যেগুলো আমরা আরো অনেক পরে চিন্তা করতে শুরু করেছি। আলো কী, এটা কিভাবে প্রবাহিত হয়? চাঁদকে কে পৃথিবীর কক্ষপথে ধরে রাখে? গ্রহগুলোকে কিভাবে সূর্য ধরে রেখেছে? আপেল গাছ থেকে কেন নিচে পড়ে? এবং মনে করা হয়, এই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যই নিউটন পৃথিবীতে এসেছিলেন।

সোভিয়েট মহাকাশ কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে?

সার্গেই পি. করোলেভ (১৯০৭-১৯৬৬) সোভিয়েট মানুষবাহী স্পেস ফ্লাইট তৈরীতে সবচে বেশি অবদান রাখেন। এবং মহাশূন্য সংক্রান্ত যাবতীয় সাফল্যের পেছনে তার নাম বলা হয়ে থাকে। সোভিয়েট মহাকাশ কার্যক্রমে তার অফিসিয়াল পদবী ছিল 'চিফ ডিজাইনার' হিসেবে। তিনি এরোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর পড়াশুনা করেন। তিনি রকেট প্রপালশনের উপর লেখাপড়ার নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৪৬ সালে দূর-পাল্লার রকেট তৈরীর সোভিয়েট কার্যক্রমের দায়িত্ব নেন। করোলেভের রকেট তৈরীর এই কৌশল অবলম্বন করে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর সর্বপ্রথম স্যাটেলাইট সফলভাবে পাঠাতে সক্ষম হয়। তার স্বপ্ন ছিল মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর। তাই তিনি অন্যান্য প্রাণী দিয়ে প্রথম সেই পরীক্ষা চালনা করেন। তাকে মানুষবাহী নভোযান তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়। রাশিয়া তখন তৈরী করছিল তাদের স্পাই স্যাটেলাইট 'জেনিথ'। করোলেভের নেতৃত্বেই সেই জেনিথ থেকে তৈরী করা হয় 'ভোস্টক

সার্গেই করোলেভ

BanglaInternet.com

স্পেসক্রাফট'। তারই ফলশ্রুতিতে ইউরি গ্যাগারিন (১৯৩৪-১৯৬৮) সফলভাবে পৃথিবীর কক্ষপথে ভ্রমণ করেন।

এলেক্সিস বাউভার্ড

এলেক্সিস বাউভার্ড

এলেক্সিস বাউভার্ড (জুন ২৭, ১৭৬৭ - জুন ৭, ১৮৪৩) ছিলেন একজন ফরাসি জোতির্বিজ্ঞানী। তার সবচে বড় অবদান হলো তিনি আটটি ধুমকেতু আবিষ্কার করেন। এবং জুপিটার, স্যাটার্ন ও ইউরেনাসের এস্ট্রোনমিকাল টেবিল তৈরী করেন। তবে তার তৈরী জুপিটার ও স্যাটার্নের টেবিল খুবই সঠিক ছিল কিন্তু ইউরেনাসের জন্য তৈরী টেবিলে পরবর্তীকালে অনেক ভুল ধরা পড়ে। এবং তিনি ধারণা করেন যে, নিশ্চই ইউরেনাসের পরে আরো একটি গ্রহ রয়েছে (অষ্টম গ্রহ) যার দ্বারা ইউরেনাসের কক্ষপথে অনিয়ম দেখা দিচ্ছে। বাউভার্ড কর্মজীবনে প্যারিস অবজার্ভেটরির ডিরেক্টর ছিলেন। যখন ফরাসি নাবিকেরা অস্ট্রেলিয়ায় পৌছে, তখন তার নামানুসারে একটি গুহার নাম রাখা হয় - বাউভার্ড গুহা। অস্ট্রেলিয়ার পার্থের সমুদ্রতীরবর্তী একটি শহরের নামও বাউভার্ড।

আর্বেইন লি ভ্যারিয়ার

আর্বেইন লি ভ্যারিয়ার (মার্চ ১১, ১৮১১ - সেপ্টেম্বর ২৩, ১৮৭৭) ছিলেন একজন ফরাসি গণিতবিদ। তাঁর বিশেষত্ব ছিল সেলেস্টিয়াল গণিত। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় প্যারিস অবজার্ভেটরিতে কাজ করেন। তার জীবনের সবচে' বড় অবদান হলো, তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে নেপচুন গ্রহটিতে খুঁজে বের করেন। ফ্রান্সিস আরাগো নামের আরেকজন ফরাসি গণিতবিদের অনুপ্রেরণায় তিনি ইউরেনাসের কক্ষপথের অনিয়মগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য গাণিতিক হিসাব শুরু করেন। এবং এগুলো মূলত ছিল ক্যাপলার ও নিউটনের সূত্রের উপর ভিত্তি করে করা। তবে কাছাকাছি সময়ে এডাম নামের আরেকজন গণিতবিদও একই হিসাব এককভাবে বের করেছিলেন। এরা দুজন দুজনকে চিনতেন না। তিনি জোহান গটফ্রাইড গ্যালে নামের একজন জার্মান জোতির্বিজ্ঞানীকে নেপচুনের অবস্থান বের করতে সহায়তা করেন। এবং তার হিসাব এতই সঠিক ছিল যে, পরবর্তীতে তার দেখানো স্থানের ১ ডিগ্রি দূরেই নেপচুনকে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি রয়েল এস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি থেকে দুবার গোল্ড মেডাল পান - ১৮৬৮ ও ১৮৭৬ সালে। তার কবরের উপর বিশাল একটি গ্লোব বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আর্বেইন ভ্যারিয়ার

Banglainternet.com

জোহান গটফ্রাইড গ্যালে

গটফ্রাইড গ্যালে

জোহান গটফ্রাইড গ্যালে (জুন ৯, ১৮১২ - জুলাই ১০, ১৯১০) ছিলেন একজন জার্মান জোতির্বিজ্ঞানী। এবং তিনি বার্লিন অবজার্ভেটরিতে কাজ করতেন। তিনিই হলেন প্রথম মানুষ যিনি নেপচুনকে প্রথম দেখতে পান। তিনি তার ছাত্রকে নিয়ে আকাশে নেপচুনকে খুঁজছিলেন এবং ঠিক জানতেন কোথায় খুঁজতে হবে (সেপ্টেম্বর ২৩, ১৮৪৬)। কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় তিনি ধুমকেতুর উপর গবেষণা করেন এবং ১৮৯৪ সালে তার ছেলে এড্রিয়াস গ্যালের সহযোগিতায় ৪১৪টি ধুমকেতুর তালিকা প্রকাশ করেন। ডিসেম্বর ২, ১৮৩৯ থেকে মার্চ ৬, ১৮৪০ - এই ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে তিনি নিজেই তিনটি ধুমকেতু আবিষ্কার করেন।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল

"[The work of James Clerk Maxwell is] the most profound and the most fruitful that physics has experienced since the time of Newton." —Albert Einstein

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (জুন ১৩, ১৮৩১ - নভেম্বর ৫, ১৮৭৯) ছিলেন একজন মহৎ গণিতবিদ ও পদার্থবিদ। তার তৈরী কিছু বিখ্যাত সূত্র রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় **ম্যাক্সওয়েল ইকুয়েশন**। এবং বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মূল বৈশিষ্টের উপর তার সূত্রগুলোই সর্বপ্রথম। তিনি গ্যাসের গতিবিদ্যার উপর আরেকটি সূত্র তৈরী করেন যা ম্যাক্সওয়েল ডিস্ট্রিবিউশন নামে পরিচিত। তার এই আবিষ্কার পরবর্তীতে 'কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্স'-এর উপর গবেষণার খুব অবদান রাখে। ১৮৬১ সালে তিনিই প্রথম সত্যিকার অর্থে রঙিন ছবি প্রস্তুত করেন। ১৮৫৯ সালে তিনি দেখান যে, শনি গ্রহের চারদিকের রিংগুলো কঠিন পদার্থের হতে পারে না; যদি কঠিন হতো, তাহলে এতোদিনে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। তিনি বলেন যে, ওই রিং-এ অনেক ছোট ছোট বস্তুকণা রয়েছে যেগুলো নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে শনির চারদিকে ঘুরছে। ১৮৯৫ সালে ম্যাক্সওয়েলের এই তত্ত্ব সঠিক হিসেবে প্রমাণ করেন জেমস কিলার। ১৮৬১ সালে তিনিই প্রথম বলেন যে, আলো হলো এক ধরনের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের রূপ।

ম্যাক্সওয়েল

তার জন্ম হয়ে স্কটল্যান্ডে এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় ও কর্মজীবন কাটে ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যাক্সওয়েলকে উনিশ শতকের সবচে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী হিসেবে দেখা হয়।

BanglaInternet.com

ক্লাইড টমবাগ

ক্লাইড টমবাগ (ফ্রেব্রুয়ারি ৪, ১৯০৬ - জানুয়ারি ১৭, ১৯৯৭) ছিলেন একজন আমেরিকান জোতির্বিজ্ঞানী যিনি ১৯৩০ সালে প্লুটোকে আবিষ্কার করেন। আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যে তার জন্ম। তার পরিবার যখন ক্যান্সাসে চলে যায়, তখন তিনি তার প্রথম টেলিস্কোপ তৈরী করেন এবং জুপিটার ও মার্স সম্পর্কে তার অবজারভেশন **লয়েল অবজার্ভেটরিতে** পাঠান। এর ফলে তিনি ওখানে চাকুরীর সুযোগ পান। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ওখানে কাজ করেন। প্লুটো আবিষ্কারের পর টমবাগ ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ এরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জোতির্বিদ্যার উপর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি একটি এস্টেরয়েড আবিষ্কার করেন যার নাম নিজের নামে সাথে মিল রেখে রাখেন **এস্টেরয়েড ১৬০৪ টমবাগ ১**। তিনি ১৪টি এস্টেরয়েড খুঁজে বের করেন। এবং তিনি সেগুলোর নাম রেখেছেন স্ত্রী, সন্তান ও নাতী-নাতনীদের নামের উপর। ১৯৩১ সালে তিনি রয়াল এস্ট্রানমিকাল সোসাইটির পুরস্কার পান। মৃত্যুর পর তাঁর কিছু দেহভস্ম দিয়ে দেয়া হয়েছে **নিউ হরাইজন** নভোযানে, যা প্লুটোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

কল্পনা চাওলা

জন্মসূত্রে ভারতীয়, কিন্তু পরবর্তীতে আমেরিকার নাগরিক কল্পনা চাওলা (১৯৬১-২০০৩) ছিলেন একজন নভোচারী। ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে যে মিশন পাঠানো হয়েছিল, সেটার রোবটের একটি বাহু পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কল্পনা চাওলা। ১৯৯৫ সালে তিনি নভোচারী হিসেবে নিযুক্ত হন। তার পূর্বে ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি নাসার 'এমস রিসার্চ সেন্টারে' ফ্লুইড ডাইনামিক্স নিয়ে গবেষণা করেন। ২০০৩ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে ১৬ দিন ফেরার পথে কলম্বিয়া বিধ্বস্ত হয় এবং তার মৃত্যু হয়। ১৯৭৬ ভারতের ঠাকুর স্কুল থেকে পাশ করে পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেন। তারপর ১৯৮৪ সালে মাস্টার্স করেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস থেকে। ১৯৮৮ সালে ইউনিভার্সিটি অফ কলরেডো থেকে পিএইচডি করেন। সবসময়ই তার লেখাপড়ার বিষয় ছিল এরোস্পেস।

কল্পনা চাওলা

Banglainternet.com

[End]